১৭-১৮
দুই খণ্ড একত্রে
বন্দী বনহুর
রোমেনা আফাজ
BELAL
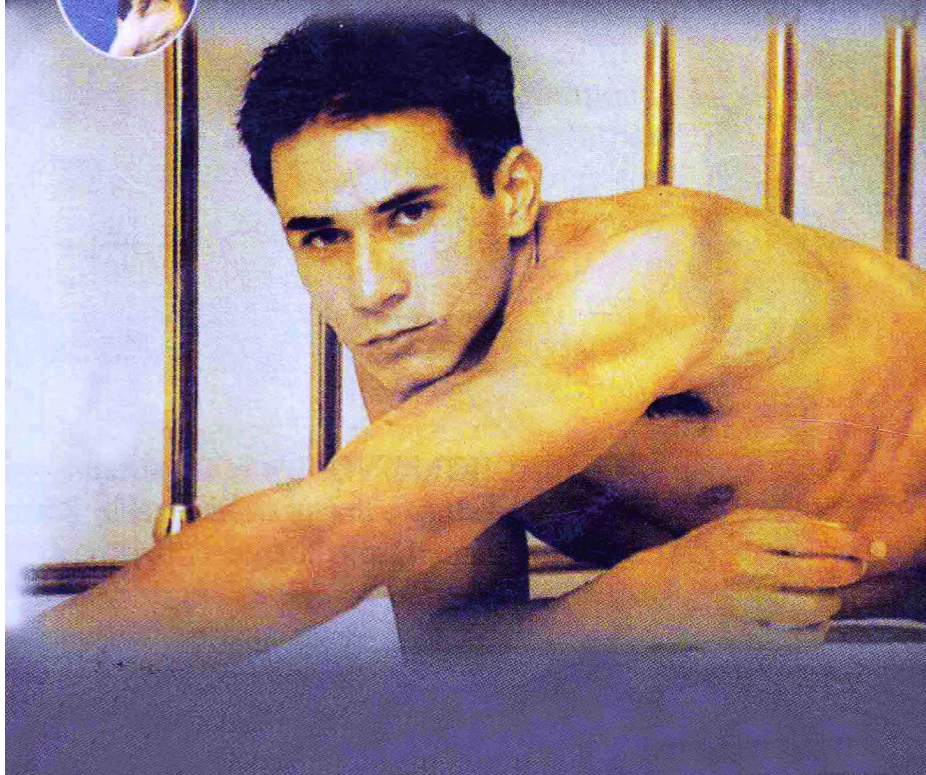
বন্দী বনহুর-১৭
দস্যু বনহুরের মৃত্যুদণ্ড-১৮

দুই খণ্ড একত্রে

রোমেনা আফাজ

পরিবেশক

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

বাদল ব্রাদার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭ ইং

মূল্য ঃ ৩০·০০ টাকা মাত্র।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১ বি, কে, দাস রোড
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন ।আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

সত্য ও ন্যায়ের প্রতীক

দস্যু বনহুর

❑

অস্ফুট কণ্ঠে বললো মনিরা—কি বললে?

বনহুর পূর্বের ন্যায় গম্ভীর গলায় বলে উঠলো—আমাকে চাও, না নূরকে?

স্বামীর কথায় মনিরার মুখমন্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো, ঢোক গিলে বললো মনিরা—এ তুমি কি বলছো! ওগো, এ তুমি কি বলছো?

দৃঢ় কণ্ঠে বললো বনহুর—যদি নূরকে চাও তবে আমাকে পাবেনা, আর যদি আমাকে চাও তবে নূরকে....

মনিরা দ্রুত বনহুরের মুখে হাত চাপা দিয়ে অশ্রুভরা কণ্ঠে বললো—না না, ওকথা আর বলোনা। আমার বুক ফেটে চৌচির হয়ে যাবে। আমি সহ্য করতে পারবো না।

পাশের কক্ষ থেকে এতোক্ষণ মরিয়ম বেগম সব শুনছিলেন। তিনি আচম্‌কা প্রবেশ করলেন কক্ষমধ্যে।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ফিরে তাকালো, একটু হক্‌চকিয়ে গেলো সে। পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে বললো বনহুর—মা!

স্থির গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালেন মরিয়ম বেগম। পাশের কক্ষ থেকে পুত্রের এবং মনিরার কথাগুলো কান পেতে তিনি শুনেছিলেন, বনহুরের কথায় রাগে শরীর তার কাঁপছিলো, এত বড় কথা সে বলতে পারলো মনিরার মুখের উপর—আমাকে চাও না নূরকে? কথাটা তাঁর হৃদয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। রাগ-ক্ষোভ-ব্যথা গুমড়ে ফিরছিলো মরিয়ম বেগমের মনের মধ্যে। মুখোভাব কঠিন করে বললেন তিনি—কে তোর মা! আমি তোর মা নই...না না, আমি তোর মা নই—ওরে পাষন্ড সন্তান! তুই মা বলে আমাকে আর কোন দিন ডাকিসনে।

মায়ের কথায় বনহুর যেন হতভম্ব হয়ে পড়লো। দস্যু হলেও মায়ের কাছে সে অবোধ বালকের মত। ম্লান মুখে বললো—মা, জানি তোমরা সবাই আমাকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছো।

আমরা নই—তুই, ওরে তুই সবাইকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছিস। নিষ্ঠুর সন্তান! আজ যে কথাগুলি মনিরাকে বললি, কোনো স্বামী পারবে তার স্ত্রীকে বলতে?

বনহুর এবার বুঝতে পারলো, তার মা পাশের কক্ষ থেকে তার এবং মনিরার সব কথাই শুনেছেন, সেই কারণেই তিনি এতো রাগান্বিত হয়েছেন। বনহুর মায়ের কথায় কোন জবাব না দিয়ে মাথা নত করলো।

মরিয়ম বেগম আরও কয়েক পা এগিয়ে এলেন পুত্রের দিকে—কোন নারী পারে তার স্বামী কিংবা পুত্রকে ত্যাগ করতে? তোর কি হৃদয় বলে কোন জিনিষ নেই?

বনহুর তার মায়ের সম্মুখে অসহায়ের মত দুর্বল হয়ে পড়লো। করুণ কণ্ঠে বললো—মা, আমি অপরাধী...তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

বল্ আর কোনদিন মনিরার সম্মুখে ঐ কথা বলবি না!

কোন্ কথা মা? বনহুর না বুঝার ভান করে।

মরিয়ম বেগম পুনরায় তীব্রকণ্ঠে বলে উঠলেন—যে কথা একটু পূর্বে তুই ওকে বলছিলি।

ও! কিন্তু তুমিই বলো মা, আমি এখানে আসি ক্ষণিকের জন্য আনন্দ উপভোগ করতে। অল্পক্ষণের জন্য ভুলতে চাই আমি আমার জীবনের সমস্ত সত্তাকে। তোমাদের মধ্যে আমি নিজকে ডুবিয়ে রাখতে চাই...কিন্তু আমি যদি এখানে এসেও এতোটুকু স্বস্তি না পাই, তাহলে......কি হবে বলো এসে?

মনির!

হাঁ, যখনই আমি আসবো, তোমার মনিরা শুধু তার সন্তানের কথা নিয়েই আত্মহারা থাকবে—এ আমি চাইনা।

বনহুরের কথায় মনিরা প্রস্তর মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলো।

মরিয়ম বেগমের মুখ দিয়েও কোন কথা বের হলোনা, তিনিও নিশ্চুপ শুনতে লাগলেন।

বনহুর আবার বলতে শুরু করলো—নূর হারিয়ে গেছে, বিলাপ করে কি হবে বলো? যদি সে বেঁচে থাকে—একদিন ফিরে আসবে।

তাই বলে তার সন্ধান করবোনা আমরা? তুমি পিতা হয়ে এ কথা বলতে পারলে? বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো মনিরা।

বেশ, তাহলে তোমরা নূরের সন্ধানেই থাকো, আমি যাই। বনহুর চলে যাবার জন্য পা বাড়ালো।

মরিয়ম বেগম বলে উঠলো—যাবি বলেই যাওয়া হলো, মনিরা তোর কেউ নয়?

থম্‌কে দাঁড়ালো বনহুর, ফিরে তাকিয়ে বললো—আমি তো ওকে অস্বীকার করিনি। ওকে খুসী করবার জন্যই চলে যাচ্ছি।

তুই চলে গেলে ও খুশী হবে?

হাঁ, আমি নূরকে খুঁজতেই যাচ্ছি। যদি ওকে পাই, ফিরে আসবো, নচেৎ নয়।

মনিরার চোখ-মুখ কেমন যেন ভাবাপন্ন হয়ে উঠলো। গভীর একটা চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো তার ললাটে। নূরকে কোন অজ্ঞাত চোর চুরি করে নিয়ে গেছে কে জানে, কোথায় পাবে তার সন্ধান সে। যদি নূরকে না পায় তাহলে আর কোনদিন ফিরে আসবেনা তার স্বামী। না না, সব সে ত্যাগ করতে পারবে, নূরের স্মৃতিও ভুলতে পারবে—ভুলতে পারবেনা তবু সে স্বামীকে।

মরিয়ম বেগম রাগে ক্ষোভে অধর দংশন করছিলেন। এ কি কথা বলছে তার মনির। নূরকে খুঁজে না পেলে আর সে ফিরে আসবে না। এতো বড় পাষন্ড সে! মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন—কি বললি, নূরকে না পেলে আর আসবিনা!

না। এসে শুধু অশ্রু আর কান্না দেখবো?

তুই বাপ না কশাই...

মা...

অবাধ্য সন্তান কোথাকার!

অবাধ্য আমি নই মা। তোমার কথা রাখতে গিয়েই আজ আমি মায়ার জালে জড়িয়ে পড়েছি। বিয়ে করেছি মনিরাকে!

শুধু তাই নয়, তুই আজ সন্তানের পিতা। পিতা হয়ে তোর সন্তানের প্রতি এতটুকু দরদ নেই?

দরদ....হাঃ হাঃ হাঃ...অদ্ভুতভাবে হেসে উঠলো বনহুর, হাঃ হাঃ হাঃ..হাঃ হাঃ হাঃ.....

মরিয়ম বেগম আর মনিরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে। মরিয়ম বেগম পুত্রকে কোনদিন এভাবে হাসতে দেখেন নাই—তিনি হতভম্ব হয়ে চেয়ে আছেন।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—বন্ধনহীন উল্‌কা আমি। আমাকে তোমরা মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না। দস্যু বনহুর কোনদিন দরদ বলে কোন জিনিষ জানে না।

মরিয়ম বেগম দু'চোখ ছানাবড়া করে বললেন—মনির, তুই এতো বড় পাষন্ড! নির্দয়...হৃদয়হীন....

তার চেয়েও বেশী।

আমি মা হয়ে তোকে পুলিশে দেবো, তোকে গ্রেফতার করিয়ে দেবো।

তোমার সন্তান হাসিমুখে মায়ের দান গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে।

ওরে আমি তাই পারবো—তোকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারবো..বনহুরকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরেন মরিয়ম বেগম—আমাকে ছেড়ে আর তুই যাসনে বাপ্......

বনহুরের চোখ দুটো অশ্রু ছল ছল হয়ে উঠলো। সেও মাকে বুকে আঁকড়ে ধরে বললো—মা, তোমাকে একদিন বলেছি, তোমার সন্তান যেখানেই থাক তোমার থাকবে। যখন তুমি ডাকবে তখনই তুমি পাবে....

কিন্তু কই তোকে পাই বলতো? কত দিন তোকে না দেখে কেঁদে কেঁদে আমার চোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গেছে, তবু তোকে পাইনি।

বনহুর এবার ম্লান হাসি হাসলো, বললো—এই তো এসেছি মা।

আবার চলে যাবি; আসবি তো?

তোমার সন্তান, তোমার পাশে না এসে কি থাকতে পারবে?

দেখা যাবে।

নিশ্চয়ই আসবো মা।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যান কক্ষ থেকে, যাবার সময় বলেন, কিছু খাবার আনছি, পালাস্‌নে যেন।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে যেতেই বনহুর ফিরে তাকালো মনিরার মুখে, কয়েক পা এগুতে এগুতে বললো—নূরের কথাই ভাববে, না আমাকে কিছু বলবে?

মনিরা চোখ তুলে তাকালো স্বামীর মুখের দিকে। ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠলো, কিন্তু কিছুই বলতে পারলো না সে।

বনহুর আরও সরে এলো, মনিরার কাঁধে হাত রেখে বললো—আমি বলছি—তোমার নূর যেখানেই থাক, ভাল থাকবে—একদিন সে ফিরে আসবে।

সত্যি বলছো?

হাঁ, সত্যি মনিরা।

কিন্তু....

আর কিন্তু নয়। মনিরা, তুমি না বলেছিলে ছবি দেখতে যাবে?

যাবো না।

কেনো?

দেখেছি।

ও!

একটা কথা তুমি আমায় সত্যি করে বলবে?

বলো?

তুমি দস্যুবৃত্তি ছেড়ে অভিনয় শুরু করেছো?

বিস্ময় ভরা চোখে তাকায় বনহুর মনিরার মুখের দিকে—অভিনয়। কে বললো আমি অভিনয় শুরু করেছি?

—আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি অস্বীকার করতে পারো না। বললো মনিরা।

মনিরার কথায় বনহুর বুঝতে পারলো, 'কুন্তি বাঈ' ছবিটাই সে দেখেছে। এবং সেই কারণেই মনিরা ভিতরে ভিতরে রাগান্বিত হয়ে পড়ছিলো। মনিরার সঙ্গে বনহুর যত কঠিন ব্যবহার করুক না কেনো, আসলে মনিরাই বনহুরের বাস্তবের রাণী। মনিরার মুখে হাসি ফুটলে এতটুকু শান্তি পায়না বনহুর মনে।

মনিরা বনহুরকে নীরব থাকতে দেখে বললো আবার—আমার কাছে লুকাতে চেষ্ট করোনা, আর কেউ তোমাকে না চিনলেও আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না। বলো—ছবির নায়িকা কে? ওর সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি? বলো—জবাব দাও?

আজ বনহুরের কাছে সব স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। মনিরার যত রাগ অভিমান সব ঐ কারণেই, এবার বুঝতে পারলো সে। হেসে বললো—তাই বুঝি সেদিন তুমি আমায় বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিলে?

মাথা নত করলো মনিরা।

বনহুর বুঝতে পারলো, তার অনুমান মিথ্যা নয়। মনিরাকে টেনে নিলো কাছে, দক্ষিণ হাত দিয়ে মুখটা তুলে ধরে বললো—তুমি অহেতুক অভিমান করছো মনিরা। অভিনয়, অভিনয়ই.....

তাহলে 'কুন্তি বাঈ' ছবির হিরো তুমি?

যদিও মনিরাও নিঃসন্দেহে জানে—কুন্তি বাঈ ছবির হিরো তার স্বামী, তবু আবার স্বামীর মুখে শুনতে চায় সে।

মনিরার কথায় বললো বনহুর—তুমি যা দেখেছো সত্যি। 'কুন্তি বাঈ' ছবির হিরো স্বয়ং দস্যু বনহুর।

বললো মনিরা— আর হিরোইন?

মিস্ জ্যোছনা রায়। ওর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ শুধু সুটিংকালে, তারপর নয়....কিন্তু মিস্ জ্যোছনা রায় আজ বেঁচে নেই—সে মৃত।

আশ্চর্য দৃষ্টি মেলে তাকালো মনিরা বনহুরের চোখের দিকে। বললো সে—মিস জ্যোছনা রায় বেঁচে নেই?

না। বনহুর ক্ষণিকের জন্য আনমনা হয়ে গেলো। উদাস কণ্ঠে বললো—জ্যোছনা রায়ের মৃত্যুর কারণ আমিই মনিরা।

তুমি?

হ্যাঁ আমি। বেচারী সুটিং-এর ফাঁকে কখন যে আমাকে ভালবেসে ফেলেছিলো, সে-ই জানে।

তুমিই তাকে হত্যা করেছিলে?

না, আমি নই...আচ্ছা বলবো আর একদিন, সে এক মস্ত কাহিনী। একটা দীর্ঘশ্বাস গোপনে চেপে যায় বনহুর। মিস জ্যোছনা রায়ের স্মৃতি যে আজও বনহুরের মনে এতোটুকু আলোড়ন জাগায় না, তা নয়। বেচারী জ্যোছনা রায়.....

মরিয়ম বেগম ইচ্ছা করেই বিলম্ব করছিলেন, ঘরে তার দুধ ছানা—ফিরনী তৈরীই ছিলো তবু তিনি এগুলো আনতে বেশ বিলম্ব করলেন।

মরিয়ম বেগম একটু কেশে কক্ষে প্রবেশ করলেন—মা মনিরা, ওকে একটু খেতে দাও।

বনহুরের পাশ থেকে সরে দাঁড়ালো মনিরা, তারপর মামীমার হাত থেকে খাবারের ট্রে নিয়ে বনহুরের সম্মুখে টেবিলে রাখলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—মিটকেসটা বন্ধ না করেই চলে এসেছি। যা বিড়ালের উপদ্রব.....

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে গেলেন।

বনহুর বুঝতে না পারলেও, মনিরা বুঝতে পারলো—মিটকেস বন্ধ করা—এটা একটা ছলনা মাত্র; কেমন করে মরিয়ম বেগম পালাবেন, তাই এতো কথা। মনিরা মামীমার অভিনয় দেখে হাসলো।

বনহুর বললো—হঠাৎ অমন করে হাসলে কেনো মনিরা?

মামীমার অভিনয় দেখে।

বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে বললো বনহুর—অভিনয়?

হাঁ দেখলে না, মামীমা আমাদের সুযোগ দিয়ে মিছামিছি বললেন—মিটকেস খুলে রেখে এসেছি, বিড়ালের যা উপদ্রব....

মনিরা হেসে উঠলো, বনহুরও তার হাসিতে যোগ দিলো।

বললো মনিরা—নাও, এবার খাও দেখি।

এতো রাতে খাবার খাওয়া ঠিক হবে?

মায়ের হাতের তৈরী জিনিসে কোন দোষ নেই।

না, তা বলছি না, বলছি পেট ভর্তি রয়েছে।

তা জানি, তোমার পেট ভর্তি রয়েছে।

তা জানি, তোমার পেট কত যে ভর্তি থাকে সে কথা আমাকে বলতে হবে না। নাও, খাও তো।

তবে দাও, কিন্তু আমাকে উঠিয়ে খাইয়ে দিতে হবে.....

হা করে বনহুর।

মনিরা স্বামীর মুখে খাবার তুলে দেয়।

❑

দোলনায় নয়—ঝুলনায় বসিয়ে দোল দিচ্ছিলো মনিকে নূরী। আর সুন্দর একটা গান গাইছিলো সে—

আমার মনি দোলে, দোলকুমারীর কোলে......

আমার মনি দোলে.....

মনির মুখেও হাসি ফুটে উঠেছে, ছোট্ট কচি শিশু মায়ের জন্য প্রথম প্রথম কাঁদাকাটা করলেও এখন আর তেমন করে না। মাঝে মাঝে বলে— মাল কাছে দাবো, আমি মাল কাছে দাবো.....

কিন্তু নূরীর আদরের বন্যায় ভেসে যায় সব। মনিকে কখনও কোলে, কখনও পিঠে, কখনও কাঁধে নূরী ঘুরে বেড়ায় বন হতে বনান্তরে। পাহাড়িয়া ঝরণার মত চঞ্চল নূরী মনিকে পেয়ে আরও উন্মত্ত হয়ে উঠে। তার বহু দিনের হারানো ধন যেন ফিরে পেয়েছে।

মনির সুন্দর নধর দেহ, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। সুন্দর দুটি চোখ, ফুলের হাসি ঠোঁটের কোণে, অপূর্ব সুন্দর চেহারা। ওকে দেখলেই কোলে নিতে ইচ্ছে করে, আদর দেবার জন্য মন লালায়িত হয়। মনি সুন্দর হবে না কেনো, পিতা স্বয়ং দস্যু বনহুর, মা অপূর্ব সুন্দরী মনিরা—কাজেই তাদের সন্তান সুন্দর হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শুধু নূরীই নয়, বনহুরের আস্তানার সবাই মনিকে ভালবাসে, স্নেহ করে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী আদর করে রহমান, 'ছোট সর্দার' বলে ডাকে ওকে।

মাঝে মাঝে মনিকে কোলে করে ঘুরে বেড়ায় রহমান। ঘোড়ার পিঠে তুলে দিয়ে আনন্দ দেয় ওকে।

মনিকে নিয়ে আস্তনার সবাই খুশীতে আত্মহারা।

কিন্তু সবাই জানে—শিশুটিকে তাদের সর্দার একদিন কোন গহন বন থেকে কুড়িয়ে এনে নূরীকে দিয়েছিলো, সেই থেকে নূরী তাকে নিজ সন্তানের মত লালন করছিলো, তারপর একদিন সেই শিশু মনি কোথায় হারিয়ে গিয়েছিলো। নূরী সদা-সর্বদা কাঁদ-কাটা করতো মনির জন্য। কিন্তু হঠাৎ তাদের সর্দার আবার একদিন সেই মনিকে কোথা থেকে এনে দিলো নূরীর কোলে।

কেউ না জানলেও জানে রহমান—মনি কে। কি তার আসল পরিচয়।

সময় সময় বনহুর মনিকে নিয়ে আদর করতো। নরম তুলতুলে গালে মৃদু চাপ দিয়ে বলতো...বাপি....

কোন কোন দিন তুলে নিতো কোলে, সকলের অলক্ষ্যে ছোট্ট একটি চুমু এঁকে দিতো ওর গালে।

এমনি একদিন মনি খেলা করছিলো একটা গাছের তলায় একটা ছোট্ট হরিণ শিশু নিয়ে। বার বার তার গলায় জড়িয়ে ধরে মাটিতে ফেলে দিচ্ছিলো।

বনহুর দূর থেকে দেখতে পেলো, এগিয়ে এলো মনির পাশে।

মনি তখনও বনহুরকে দেখতে পায়নি, সে আপন মনে খেলা করছিলো।

বনহুর তন্ময় হয়ে দেখছিলো মনি আর হরিণ শিশুর অদ্ভুত খেলা।

হরিণ শিশুর পিঠে চেপে বসতে গিয়ে হঠাৎ ভূতলে পড়ে গেলো মনি।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর তুলে নিলো মনিকে হাতের উপর।

মনি কেঁদে উঠেই বনহুরকে দেখে চুপ হয়ে গেলো।

বনহুর আদর দিয়ে বললো—একটুও লাগেনি, তাই না বাপি.....চুমু দিলো মনির ছোট্ট মুখে।

মনি খুব খুশী না হলেও বনহুরের কোলে গিয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিলো।

বনহুর যখন মনিকে আদর দিচ্ছিলো তখন নূরী পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ালো একটা গাছের আড়ালে। উঁকি দিয়ে দেখতে লাগলো সে। বনহুর কোন দিন স্ব-ইচ্ছায় মনিকে আদর করেনি নূরীর সম্মুখে। কতদিন এ নিয়ে বনহুরের সঙ্গে রাগারাগি করেছে, আর আজ বনহুরকে মনির সঙ্গে দেখে শুধু খুসীই হলোনা, আনন্দে আত্মহারা হলো।

বনহুর মনির ললাটে চুমু দিয়ে বললো—আমি তোমার কে বললো মনি?

মনি হঠাৎ দেখে ফেলে নূরীকে। বনহুরের কোলে গিয়ে একটু বিব্রত বোধ করছিলো, নূরীকে দেখে মুখখানা হাসিতে ভরে উঠলো।

বনহুর তখন পুনরায় বললো—আমি তোমার কে বলো—বলো...বলো আমি তোমার বাপি!

বনহুর মনিকে চেপে ধরলো বুকে।

নূরী আড়াল থেকে সব দেখলো, খুসীতে ভরে উঠলো ওর মন। চঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে এলো বনহুর আর মনির পাশে। খিল খিল করে হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলো।

বনহুর হঠাৎ নূরীর আগমনে একটু হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো। মনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বললো—যাও মনি।

নূরী বললো—তুমি যদি বাপি হও, আমি কে?

বনহুর মনির মুখের কাছে মুখ নিয়ে বললো—বলোতে মনি, ও তোমার কে?

মনি এক গাল হেসে বলে উঠলো—মাম্মি...

বনহুর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে পড়লো।

নূরী মনিকে বুকে তুলে নিয়ে হাসিতে ফেটে পড়লো—দেখো মনি ঠিক বলেছে।

বনহুর আর নূরী যখন মনিকে নিয়ে আনন্দে আত্মহারা—এ কথা সে কথা নিয়ে খুশীর ফুলঝুরি ঝরে পড়েছিলো তাদের মনে, ঠিক সেই সময় রহমান আর মহসীন এসে কুর্নিশ জানালো।

বনহুর ফিরে তাকালো রহমানের মুখে—কি খবর রহমান?

রহমান বললো—সর্দার, একবার দরবার কক্ষে আসুন, কথা আছে।

চলো। বনহুর দরবার কক্ষের দিকে এগুলো।

রহমান আর মহসীন অনুসরণ করলো তাকে।

ভূগর্ভে পাথর খোদাই করা একটা বৃহৎ কক্ষ। গভীর অন্ধকারে কক্ষটা সদা অন্ধকার। কিন্তু মশালের আলোতে আলোকিত করা হয়েছে কক্ষটাকে। কক্ষের দেয়ালে অসংখ্য অস্ত্র —সস্ত্র ঝোলানো রয়েছে।

কক্ষের দরজায় দু'জন পাহারাদার দন্ডায়মান। তাদের শরীরে জমকালো পোষাক, মাথায় জমকালো পাগড়ী। ভয়ঙ্কর চেহারা, হাতে রাইফেল।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই অন্যান্য দস্যুগণ কুর্ণিশ জানালো।

বনহুর এসে বসলো তার পাথরাসনে।

রহমান আর মহসীন দাঁড়ালো সম্মুখে।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বললো—কি খবর বলো?

রহমান ইংগিত করলো মহসীনকে বলতে।

মহসীন একটু কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিলো। যত সাহসীই হোকনা কেনো সর্দারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তাদের একটু কেমন যেন লাগতো।

বললো মহসীন—সর্দার, মতি মহল হলের মালিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মতি মহল হলের মালিক আফ্গানী সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

হাঁ, সর্দার।

তার অপরাধ?

অপরাধ 'কুন্তিবাঈ' ছবি তার হলে চালানোর দরুণ---

'কুন্তিবাঈ' ছবি।

হাঁ সর্দার। 'কুন্তিবাঈ' ছবির ফিলম সম্পূর্ণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দেওয়া সত্বেও আফ্গানী সাহেব তার হলে ছবি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কারণ এ ছবিতে দর্শকের এতো ভীড় জীবনে তার হলে কোন ছবিতে হয়নি।

রহমান বললো এবার —দর্শক মহলে ছবিটা যেমন সুখ্যাতি অর্জন করেছিলো, তেমনি পুলিশ মহলে সৃষ্টি করেছিলো আলোড়ন। শুধু আলোড়নই নয়—তাদের মনে জাগিয়েছিলো ভীষণ চাঞ্চল্য।

হুঁ, তারপর?

সর্দার, এ ছবির হিরো দস্যু বনহুর—এটাই ছিলো দর্শক মনে এক প্রচন্ড উন্মাদনা। মিঃ জাফরী এটা আবিস্কার করেছিলেন সর্বপ্রথম। এবং তিনিই সমস্ত শহর অঞ্চলে ও বিভিন্ন নগরে দস্যু বনহুরের আগমন ঘোষণা করে তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতে মতিমহল হলে দর্শকের ভীড় বেড়ে গিয়েছিল চরম আকারে। দেশের জনগণ সবাই চায় অন্ততঃ দস্যু বনহুরকে একটিবার দেখতে। কাজেই মালিক আফগানী সাহেব ছবিটা চট্ করে বন্ধ করতে পারেননি—এটাই হলো তাঁর অপরাধ।

বনহুর বললো—ছবিটা কি বন্ধ হয়ে গেছে?

হাঁ সর্দার, কিন্তু আজও চলবে। কারণ আজ মিঃ জাফরী তার দলবল নিয়ে ছবি দেখবেন এবং সমস্ত দর্শক মন্ডলির সম্মুখে ছবিটা বিনষ্ট করা হবে।

এতো খবর সংগ্রহ করলে কেমন করে তোমরা?

সর্দার, মহসীন কৌশলে এ সব সংবাদ সংগ্রহ করেছে।

বেশ, আজ আমিও যাবো মতি মহল হলে ছবি দেখতে।

মহসীন, তুমি অগ্রিম টিকিট ক্রয় করে রাখবে, এবং ঠিক্ মিঃ জাফরীর পাশেই যেন আমার সিট্ হয়।

জী সর্দার।

এবার বনহুর নিজ মনে বলে উঠলো—মিঃ জাফরীর সঙ্গে আমার মোকাবেলা হবে। শোন রহমান, তুমি আর কায়েস আমার কুইন গাড়ী নিয়ে অপেক্ষা করবে পুলিশ অফিসের অদূরে পথে। আজই আফগানী সাহেবকেও মুক্ত করে আনবো।

বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো।

অন্যান্য অনুচরগণ কুর্ণিশ জানালো নত মস্তকে।

বনহুর দরবার কক্ষ ত্যাগ করলো।

❑

পুলিশ অফিসের হাজত—কক্ষে বন্দী আফগানী সাহেব। ভদ্রলোক অত্যন্ত অমায়িক এবং মহৎ লোক। দেশবাসীগণ তাঁর নিকটে যথেষ্ট উপকৃত। দস্যু বনহুরও অনেক সময় এর নিকটে অনেক ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছে—অবশ্য দস্যু হিসাবে নয়, বন্ধু হিসাবে।

বনহুর যখন সর্ব প্রথম মনিরার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলো তখন একদিন নাথুরামের সঙ্গে সংঘর্ষ ব্যাপারে কয়েকখানা গাড়ীর প্রয়োজন হয়েছিলো; তখন আফগানী সাহেব বিনা দ্বিধায় কয়টি গাড়ী দিয়েছিলেন তাকে।

বহু দিনের কথা হলেও আজও বনহুর ভোলেনি তার উপকারের কথা।

সেদিন বনহুর এক ভদ্র নাগরিকের বেশেই আফগানী সাহেবের নিকটে গমন করেছিলো মিথ্যা এক পরিচয় দিয়ে তার কাছে কয়েকটা গাড়ী সাহায্য চেয়েছিলো। আফগানী সাহেব সেদিন বনহুরকে গাড়ী না দিলেও বলবার কিছু ছিলনা। কারণ, ইতিপূর্বে আফগানী সাহেব কোনদিন তাকে দেখেন নাই বা তার সঙ্গে কোন রকম আলাপ ছিলোনা।

আফগানী সাহেবের মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সেদিন দস্যু বনহুর শুধু মুগ্ধই হয়েছিলোনা, কৃতজ্ঞও হয়েছিলো সেদিন সে।

আজ সেই আফগানী সাহেব বিনা অপরাধে হাজত—কক্ষে পচে মরছেন।

কথাটা বনহুরের মনে দারুণ আঘাত করেছিলো। একটা ব্যথার ছোঁয়া খোঁচা দিয়েছিলো তার মনের কোণে।

অগণিত দর্শক মতিমহল হলের সম্মুখে ভীড় জমিয়ে দিয়েছে। অসংখ্য গাড়ী থেমে আছে হলের পাশে। আজ শহর এবং দূর অঞ্চলের জনগণ অনেকেই এসেছে কারণ আজ 'কুন্তি বাঈ' ছবির শেষ শো। তাছাড়া বিজ্ঞপ্তির মধ্যে একথাও প্রচার করা হয়েছে আজকের শো শেষ হবার পর এ ফিল্ম্ নষ্ট করে ফেলা হবে।

এ কারণেই দর্শক মহলে একটা বিপুল আগ্রহ জেগেছে।

থেমে থাকা অসংখ্য গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালো একটা নতুন ঝকঝকে কুইন গাড়ী।

একটু আগে যে গাড়ীখানা এসে দাঁড়িয়েছে, সে গাড়ী থেকে নামলেন পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী ও তার সহকারী মিঃ হোসেন। মিঃ জাফরী

এবং মিঃ হোসেন যখন হলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন; ঠিক সেই মুহূর্তে কুইন গাড়ী এসে থামলো। গাড়ীর মধ্যে থেকে নেমে এলেন শুভ্রকেশ, মুখে শুভ্র দাড়ি, চোখে চশমা, দেহটা অর্ধ নূয়ে পড়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি—আভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট ফুটে রয়েছে তার চোখে-মুখে।

দক্ষিণ হস্তে মূল্যবান একখানা ছড়ি।

ছড়ির বাটে রূপার কারুকার্য করা। বাটের মাথাটা ব্যাঘ্র মোখাকারে তৈরী। ব্যাঘ্রের চোখ দুইটি উজ্জ্বল পাথর বসানো।

প্রবীন ব্যক্তি ছড়িতে ভর দিয়ে এগুলেন, দক্ষিণ হাতখানা মৃদু মৃদু কাঁপছে।

হলে প্রবেশ করে মিঃ জাফরীর আসনের পাশে এসে বসলেন। মিঃ জাফরীর অপর পাশে মিঃ হোসেন বসেছেন।

শো শুরু হবার এখনও কিছু বাকী আছে।

গোটা হলঘর নীলাভো আলোতে আলোকিত।

মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক—আদাব ইন্সপেক্টার সাহেব।

মিঃ জাফরী একটু আশ্চর্য হলেন, স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন—কে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কোথায় যেন দেখেছেন, কিন্তু মনে করতে পারছেন না।

হাসলেন বৃদ্ধ ভদ্রলোক —আমাকে চিনতে পারছেন না ইন্সপেক্টর!

এমন সময় মিঃ হোসেন বলে উঠলেন—উনি ইন্সপেক্টার আহম্মদ সাহেবের শ্বশুর সাহেব--

মিঃ হোসেন বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নাম বলতে ইতস্ততঃ করছেন দেখে উনি নিজেই বললেন—আমার নাম, আবুল কাসেম মোহাম্মদ চিস্তি।

ওঃ এবার মনে পড়েছে। মিঃ জাফরী উঠে তার সঙ্গে হ্যান্ডসেক্ করলেন।

মিঃ হোসেনও হ্যান্ডসেক করলেন চিস্তি সাহেবের সঙ্গে।

মিঃ জাফরী আসন গ্রহণ করে বললেন—বহুকাল আগের দেখা তো, কেমন যে ভুলে গিয়েছিলাম—মাফ করবেন।

না না, এটা এমন কি ব্যাপার, অমন হয়েই থাকে।

মিঃ জাফরী ঠিক হয়ে বসে বললেন—আপনি কবে এসেছেন কান্দাই শহরে?

গত পরশু সন্ধ্যার ট্রেনে।

আজও আপনার দেশের কথা ভুলতে পারিনি চিস্তি সাহেব, সত্যি বড় মনোরম দেশ—মন্দরা নামের ঠিক উল্টো। ওখান থেকে ফিরেই চলে এসেছি কান্দাই এ।

হাঁ, আমি আহম্মদের মুখে শুনেছিলাম, কান্দাই এ আপনি স্ব —ইচ্ছায় আগমন করেছেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্যই নাকি আপনার কান্দাই আগমন হয়েছিলো।

জি হাঁ, দস্যু বনহুরই আমার কান্দাই আগমনের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আজও আমি সাফল্য লাভে সক্ষম হইনি। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করেন মিঃ জাফরী।

প্রবীণ ব্যক্তি একটু হেসে বললেন—সুচতুর দস্যু তাহলে আপনাকে বেশ নাজেহাল করে ছাড়ছে?

হাঁ, বলতে লজ্জা নাই—শয়তান শুধু আমাকেই নয় সমস্ত পুলিশ মহলের চোখে ঘুলি লাগিয়ে ছেড়েছে। আজকের ছবি দেখলেই বুঝতে পারবেন দস্যু এখন লোক সমাজে মিশে চিত্রনায়ক হয়েছে।

আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর!

শুধু আশ্চর্যই নয় চিস্তি সাহেব, আজাকের ছবি দেখুন—সব বুঝতে পারবেন। এমন নিখুঁত অভিনয় করেছে, যেন সত্যি একজন অভিজ্ঞ শিল্পী। দর্শক মনে সে আসন গড়ে নেবার এটা একটা নতুন পন্থা অবলম্বন করেছে--

শো শুরু হবার পূর্বে গোটা হল ঘরের আলো নিভে গেলো।

বৃদ্ধ চিস্তি সাহেব চোখের চশমাটা রুমালে মুছে পুনরায় চোখে পরে নিলেন।

পর্দায় টাইটেল চলছে। সঙ্গে মিউজিকের সুন্দর একটা সুর একটানা বেজে চলেছে।

শো আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্তে হঠাৎ চিস্তি সাহেব বলে উঠলেন—বুকের মধ্যে কেমন ব্যথা অনুভব করছি।

মিঃ জাফরী বলে উঠেন—খুব কি অসুস্থ বোধ করছেন।

হাঁ, অত্যন্ত বেশী। বুকের মধ্যে কেমন যেন হচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম--- চিস্তি সাহেব ঢলে পড়ে যাচ্ছিলেন, ধরে ফেললেন মিঃ হোসেন।

চিস্তি সাহেব কোঁকিয়ে বললেন—মাঝে মাঝে আমার এই রকম হয়। কিন্তু আজ যেন অত্যন্ত বেশী---মনে করছি--

ওদিকে তখন শো শুরু হয়ে গেছে।

হঠাৎ এই দুর্ঘটনার জন্য মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন চিন্তিত হলেন। কিন্তু হলের মধ্যে কোন উপায় নেই। চিস্তি সাহেবকে ধরে অতি কষ্টে হলের বাইরে নিয়ে এলেন মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন।

আহম্মদ সাহেব একজন সুদক্ষ পুলিশ ইন্সপেক্টার, তাছাড়া মিঃ জাফরীর বন্ধুলোক। এ অবস্থায় তার বৃদ্ধ শ্বশুরকে একা ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

আহম্মদ সাহেব কান্দাই এ নাই, তিনি কোন এক কাজে কান্দাই এর বাইরে গেছেন। কাজেই বাসায় ফোন করে কোন ফল হবে না।

ড্রাইভার গাড়ীর হ্যান্ডেলে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিলো। মিঃ জাফরী এবং মিঃ হেসেন চিস্তি সাহেবকে নিয়ে গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন পাহারারত কয়েকজন পুলিশ এগিয়ে এসেছে ইন্সপেক্টার সাহেবদ্বয়কে সহায়তা করতে।

ড্রাইভারও নেমে পড়লো গাড়ী থেকে, হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারলোনা সে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন মিঃ চিস্তি সাহেবকে পুলিশদের সহায়তায় গাড়ীতে উঠিয়ে নিলেন।

অতি সাবধানে পিছনের আসনে চিস্তি সাহেবকে শুইয়ে দিয়ে মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন উঠে বসলেন।

মিঃ জাফরী চিস্তি সাহেবের মাথার নিকটে বসে বললেন— এখন কি খুব অসুস্থ বোধ করছেন?

হাত নেড়ে বললেন চিস্তি সাহেব, তিনি কথা বলতে পারছেন না।

কাজেই আর কেউ চিস্তি সাহেবকে বিরক্ত না করে নীরব রইলেন।

মিঃ হোসেন বললেন—ড্রাইভার, কান্দাই হসপিটালে চলো!

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো ড্রাইভার।

গাড়ীর দুই পাশে পুলিশ ফোর্স স্যালুট করে দাঁড়ালো।

মিঃ জাফরীর মনে সদা আশঙ্কা হচ্ছে—বেচারী বুড়ো মানুষ চিস্তি সাহেব হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন, হসপিটাল পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হবেন কিনা সন্দেহ।

হঠাৎ যদি মন্দ কিছু হয়ে পড়ে তাহলে বন্ধুবর আহম্মদ সাহেবের নিকটে কি জবাব দেবেন। তাদের সম্মুখে তার শ্বশুর এ অবস্থা হয়েছিলো, অথচ ঠিকমত চিকিৎসা হয়নি। কাজেই মিঃ জাফরী স্বয়ং চললেন তার জরুরী কাজ ফেলে।

গাড়ী অত্যন্ত স্পীডে ছুটে চলেছে।

কান্দাই শহরের হসপিটাল শহরের প্রায় শেষপ্রান্তে, একটা নির্জন সুউচ্চ স্থানে। স্থানটা অত্যন্ত মনোরম এবং নীরব—নির্জন শহরের কর্ম—কোলাহলের বাইরে। কোন যানবাহন বা কলকারখানার শব্দ কান্দাই হসপিটালের রোগীদের অসুস্থ মনকে আরও অশান্ত করে তোলেনা।

কাজেই এ পথটা অত্যন্ত নির্জন নিরিবিলি।

মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন ও চিস্তি সাহেবসহ গাড়ীর মধ্যে বসে আছেন। ড্রাইভার তাদের অভিজ্ঞ লোক, পুলিশ হাওলাদার সে!

হসপিটাল অভিমুখে উল্কবেগে গাড়ী ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে পাশ কেটে চলে যাচ্ছে দু'একটা প্রাইভেট কার বা ভাড়াটে গাড়ী।

কিছুক্ষণ চলার পর হঠাৎ গাড়ীখানা বাঁক ঘুরে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে চললো। এ পথ অত্যন্ত নিরিবিলি, শহরের কোন গাড়ীই সহসা এ পথে চলেনা।

এতো স্পীডে গাড়ীখানাকে চলতে দেখে মিঃ জাফরীর চমক ভাংলো। মিঃ জাফরী কোন কথা বলবার পূর্বেই গাড়ীখানা থেমে পড়লো আশ্চর্যভাবে। সঙ্গে সঙ্গে জনাব চিস্তি সাহেব মিঃ জাফরীর বুকে রিভলভার চেপে ধরেন, চাপা কণ্ঠে বললেন—একটু নড়েছেন—অমনি সঙ্গে সঙ্গে মরবেন।

ড্রাইভার নিজের আসনের পাশে মিঃ হোসেনের বুকে আর একটি রিভলভার চেপে ধরেছে।

আচমকা এমন একটা ঘটনা ভাবতেও পারেননি মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন।

আজীবন মিঃ জাফরী পুলিশের চাকুরী করে আসছেন—তার মত দক্ষ ইন্সপেক্টর কমই আছেন! কিন্তু আজকের মত এমন অবস্থায় তিনি কখনও পড়েননি।

মিঃ জাফরী কোন দিন কাউকে স্বাভাবিকভাবে বিশ্বাস করতেন না। অপরিচিত এবং আত্মীয় —স্বজন ছাড়া কারো সঙ্গে তিনি কোথাও কোনদিন যেতেন না বা কারো দাওয়াত গ্রহণ করতেন না।

হঠাৎ আহম্মদ সাহেবের শ্বশুর প্রবীন ব্যক্তি অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন ভেবে তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন অন্য কোন কথা।

মিঃ জাফরী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন যেন। মিঃ হোসেন সাহেবের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছে। ড্রাইভার তার কণ্ঠদেশে রিভলভার চেপে ধরেছে ভীষণভাবে।

এদিকে মিঃ জাফরীর পাঁজরে চিস্তি সাবে রিভলভার চেপে ধরে একটা বাঁশীতে ফুঁদিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে কয়েজন বলিষ্ঠ লোক বেরিয়ে এলো পথপার্শ্বের ঝোপ—ঝাড়ের মধ্য থেকে।

চিস্তি সাহেবের ইংগিতে লোকগুলি মজবুত দড়ি দিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেললো মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেনকে।

মিঃ জাফরী গম্ভীর কণ্ঠে বললেন —কি --তুমি--চিস্তি সাহেবের ছদ্মবেশে আমাকে --রাগে, ক্ষোভে মিঃ জাফরীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেলেন।

মিঃ হোসেনও ভীষণভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন, দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরে পড়েছিলো।

এবার চিস্তি সাহেব ড্রাইভারকে আদেশ করলেন গাড়ী ছাড়তে। ঝোপের আড়াল থেকে যেসব ভীষণ চেহারার লোক বেরিয়ে এসেছিলো তারা পুনরায় অদৃশ্য হলো ঝোপের আড়ালে।

গাড়ীখানা আবার ছুটতে শুরু করলো।

❑

বনহুরের দরবার কক্ষ।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং দস্যু বনহুর।

সম্মুখে হস্তপদ বন্ধন অবস্থায় মিঃ জাফরী ও হোসেন সাহেব দন্ডায়মান।

সুতীক্ষ্ণ বর্শা হস্তে কয়েকজন দস্যু মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের আশে—পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুরের আদেশে রহমান মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেনের কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার খুলে নিলো।

ক্রুদ্ধ অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাকিয়ে আছেন মিঃ জাফরী দস্যু বনহুরের মুখের দিকে।

হেসে বললো বনহুর—কি দেখছেন অমন করে?

কে তুমি?

হাঃ হাঃ হাঃ এখনও আপনার বন্ধুকে চিনতে পারেন নি?

তুমিই কি---

হাঁ, আমিই গত রাতের চিস্তি সাহেব।

তুমি! তুমিই--

শুধু চিস্তি সাহেবই নই, তোমার বন্ধু দস্যু বনহুর।

তুমি! তুমি দস্যু বনহুর?

হাঁ আমি--বন্ধু, তোমার কোন ক্ষতি করবো না। কিন্তু একটা কথা তোমাকে লিখে দিতে হবে, তাহলে মুক্তি দেবো।

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন একযোগে তাকালেন বনহুরের মুখের দিকে।

মুক্তি শব্দটা যেন তাদের কানে আজ মধু বর্ষণ করলো। জীবনে কত চোর —ডাকু—দুষ্ট লোককে মিঃ জাফরী এবং হোসেন সাহেব কারা—কক্ষে বন্দী

করেছেন, তার কোন হিসাব নেই। কোনদিন তাদের মনে উঁকি দেয়নি বন্দী হলে তাদের অবস্থা কি হয়। আজ পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয় নিজেদের চরম অবস্থায় উপনীত হয়ে মুক্তি কথাটার আস্বাদ পেলেন।

বললেন মিঃ জাফরী—কি লেখা চাও তুমি?

একটা চিঠি।

চিঠি?

হাঁ, আফগানী সাহেবকে মুক্তি দেবার জন্য একটা চিঠি দেবেন, পুলিশ কমিশনারের কাছে। আফগানী সাহেবের মুক্তির পর মুক্তি পাবেন আপনারা।

এবার বনহুর রহমানকে বললো—একটা কাগজ-কলম এনে দাও।

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রহমান কাগজ আর কলম এনে মিঃ জাফরীর সম্মুখে পাথরের টেবিলের উপর রাখলো।

বনহুর আসন ত্যাগ করে উঠে এলো মিঃ জাফরী আর হোসেন সাহেবের সম্মুখে। কঠিন কণ্ঠে বললো বনহুর —লিখুন।

না। মিঃ জাফরীও কঠিন গলায় বললেন—আমি লিখবো না।

কেনো?

আইনে সে অপরাধী।

যত অপরাধই সে করে থাকুক তবু তার যতক্ষণ মুক্তি না হবে ততক্ষণ মুক্তি নাই আপনাদের।

তাই বলে আইনের বিরুদ্ধে কাজ করবো!

করতে বাধ্য করবো মিঃ জাফরী। রহমান------------

সঙ্গে সঙ্গে রহমান রিভলভার চেপে ধরলো মিঃ জাফরীর পাঁজরে।

বনহুর দাঁতে-দাঁত পিষে বললো—মৃত্যু চান না আফগানী সাহেবকে মুক্তি দিতে চান বলুন?

বনহুর কখনও মিঃ জাফরীকে 'তুমি' কখনও 'আপনি' বলে সম্বোধন করছিলো। অবশ্য বিশেষ কোন সময়ে বনহুর 'তুমি' শব্দই উচ্চারণ করতো।

বনহুরের কথায় বললেন মিঃ জাফরী—আইনের বিরুদ্ধে কিছুই করবো না আমি।

মরতে তাহলে আপত্তি নেই?

রহমান রিভলভার সরিয়ে নিলো। বনহুর মিঃ জাফরীর কণ্ঠদেশে চেপে ধরলো সুতীক্ষ্ণধার একখানা ছোরা।

একটু চাপ পড়তেই গলাটা চিড় চিড় করে উঠলো। মিঃ জাফরীর বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করছে। একবার মিঃ জাফরী তাকালেন মিঃ হোসেনের মুখে।

মিঃ হোসেন চোখের ইংগিতে তাঁকে চিঠিখানা লিখে দিতে বললেন।

মিঃ জাফরী কলমটা তুলে নিলেন হতের মুঠায়। বনহুর স্বয়ং মিঃ জাফরীর হাতের বন্ধন মুক্ত করে দিলো—লিখুন।

মিঃ জাফরী কাগজটা এগিয়ে নিলেন।

বনহুর বলতে লাগলো—লিখুন, আমি এবং মিঃ হোসেন দস্যু বনহুরের হস্তে বন্দী! আমাদের মুক্তির জন্য আফগানী সাহেবের মুক্তি দিতে হবে। আপনি তাকে অচিরে মুক্তি দেবার ব্যবস্থা করুন। একটু থেমে বললো সে—কার কাছে লিখলে আপনার কথা ঠিক থাকবে তারই কাছে লিখুন। পঞ্চাশ হাজার টাকা নয়, বা এক লক্ষ নয়—শুধু আফগানী সাহেবের মুক্ত---

মিঃ জাফরী কিছুক্ষণ চিন্তা করে ঘন ঘন করে লেখলেন, তারপর কাগজটা সরিয়ে রাখলেন এক পাশে। কলমটা এক রকম ছুড়েই ফেলে দিলেন টেবিলে।

বনহুর কাগজখনা তুলে নিলো হাতে; চোখের সম্মুখে মেলে ধরলো। হাঁ, বনহুর যা বলেছেন, তাই লিখেছেন মিঃ জাফরী। পুলিশ ইন্সপেক্টার আহম্মদ সাহেবের কাছে লিখেছেন তিনি।

বনহুর চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে বললো—মনে রাখবেন এর মধ্যে কোন চাতুরী খেলবার চেষ্টা করেছেন, কি মরেছেন। যতক্ষণ না আফগানী সাহেব হাজত থেকে মুক্তি লাভ করছেন ততক্ষণ আপনারা আমার বন্দী। মিঃ জাফরী, আপনি আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য লক্ষ্য টাকা ঘোষণা করতেও দ্বিধা বোধ করেননি, জীবিত কিংবা মৃত—যে কোন অবস্থায় আমাকে পেলে, আপনার পুলিশ চাকুরী জীবন আজ সার্থক হতো। কিন্তু সে আশা আপনার সফল হয়নি, গত রাতেই আপনি মতিমহল হলে বসে এ কথা চিস্তি সাহেবের নিকট দুঃখ করে বলেছেন।

একটু থেমে বললো বনহুর—মিঃ জাফরী, আপনি আমাকে যতই শত্রু মনে করেন, আসলে আমি আপনার বন্ধু। আজ ইচ্ছা করলে আপনাকে এবং আপনার সহকারীকে এই মুহুর্তে হত্যা করতে পারি কিন্তু করবো না।

এতোগুলো কথা এক সঙ্গে বলে বনহুর নীরব হলো। রহমান এবং অন্যান্য দস্যুগণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কারো মুখে কোন শব্দ নেই।

দরবার কক্ষের মধ্যে কয়েকটা মশাল দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। গোটা কক্ষটা জমকালো পাথরে তৈরী। মশালের আলোতে কালো পাথরগুলি কেমন যেন ভয়াবহ লাগছিলো। লৌহ শিকলে বন্ধন অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেন।

একটা সূঁচ পড়ার শব্দও হচ্ছে না দরবার কক্ষে।

বনহুর আবার বললো—অতোখানি পিশাচ আমি নই।

মিঃ জাফরী, বললেন এবার—তা আমরা জানি দস্যু হলেও তোমার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় আরও অনেকেই জানে।

মিঃ হোসেন বলে উঠলেন—তোমাকে গ্রেপ্তারের ইচ্ছা থাকলেও তোমার প্রতি পুলিশ মহলেরও একটা আন্তরিকতা আছে!

এ কথা আপনারা প্রকাশ না করলেও আমি জানি। আর জানি বলেই আজ আমি আপনাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিনি। মিঃ জাফরী আমি আপনাকে এবং আপনার সহকারী মিঃ হোসেনকে কথা দিচ্ছি—কোন ক্ষতি আপনাদের হবেনা।

এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বললো বনহুর—এদের সসম্মানে নিয়ে যাও, বন্দী করে রাখো। কোন অসুবিধা যেন না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখো।

রহমান মাথা নত করে বললো—আচ্ছা সর্দার।

রহমানের ইংগিতে দুইজন অনুচর মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনকে নিয়ে গেলো সেখান থেকে।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেনকে নিয়ে যাবার পর বনহুর রহমানকে বললো—এই চিঠিখানা পুলিশ অফিসে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করো।

আচ্ছা সর্দার।

তারপর অন্যান্য খবরের জন্য কায়েসকে ছদ্মবেশে পুলিশ অফিসেই অপেক্ষা করতে বলো। আফগানী সাহেবকে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত কোন কথা নয়।

বনহুর দবার কক্ষ ত্যাগ করতে যাচ্ছিলো, বললো রহমান—সর্দার, ডক্টর হংকিং ও ডক্টার মংলাও—এদের কি এখন মুক্তি দেওয়া হবে?

দাঁড়িয়ে একটু করে বললো বনহুর—হাঁ, ওদের এবার মুক্তি দেওয়া যায়, কিন্তু আর যেন ঐ ধরনের কাজে লিপ্ত না হয় তার জন্য সায়েস্তাও করে দিতে হবে।

কথা শেষ করে বেরিয়ে যায় বনহুর।

❑

ডক্টর হংকিং আর মংলাওকে মুক্তি দিলো বনহুর কিন্তু তাকে সাবধান করে দিলো আর যেন সে এ ব্যবসায়ে লিপ্ত না হয়।

প্রায় পনেরো বিশ দিন পর ছাড়া পেলো ডক্টর হংকিং ও মংলাও।

হংকিং ও মংলাও ছাড়া পেয়েই চললো হোটেল গুলবাগে মোটা অঙ্কের টাকা পাওনাদার আছে এখন তারা।

হংকিং ও মংলাও হোটেল গুলবাগে প্রবেশ করতেই মহব্বৎ আলী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হলো, সশব্যস্তে উঠে এগিয়ে এলো—আপনারা?

হংকিং বললো—ভিতরে আসুন, বলছি সব।

হংকিং আর মংলাও এর বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখভাব লক্ষ্য করে আরও হতভম্ব হয়ে পড়েছে মহব্বৎ আলী; ব্যাপার কি? সেদিন ওভাবে এলো, টাকা নিয়ে চলে গেলো। আর কোন দিন কান্দাই—এ পা রাখবেনা বলে গেলো, কিন্তু---

হংকিং আর মংলাও মহব্বৎ আলীকে ভাববার সময় না দিয়ে এগিয়ে গেলো মালখানার দিকে।

মহব্বৎ আলীও তাদের অনুসরণ করলো।

মালখানায় মালপত্র রাখছিলো দুই জন লোক।

মহব্বৎ আলী, হংকিং ও মংলাও এসে বসলো গোল টেবিলটার পাশে।

মহব্বৎ আলী আর মংলা—এর মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি জন্মেছে। চোখে মুখে বেশ একটা উৎকুন্ঠার ভাব ফুটে উঠেছে।

লোক দু'টো গুদাম ঘরে ঔষধের বাক্সগুলি ঠিকভাবে সাজিয়ে রাখছিলো বাক্সের সম্মুখে সাজিয়ে রাখছিলো হোটেলের প্রয়োজনীয় জিনিষ—পত্র, আর পিছন দিকে ভেজাল মিশানো ঔষধের বাক্স।

মহব্বৎ আলী স্বয়ং এদের দিয়ে কাজ করাচ্ছিলেন, চোরা কারবারীদের সদা আশঙ্কা—কখন কোন্ বিপদ এসে পড়ে। বিশেষ করে পুলিশের ভয়তো আছেই, তারপর দস্যু বনহুরের ভয়ও কম নয়। সেদিন মংলাও আর হংকিং এর মুখে যখন জানতে পেরেছিলো দস্যু বনহুরের কবলে তারা পড়েছিলো কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরে এসেছে সেই দিন হতে মহব্বৎ আলীর বুকটাও ধক্ ধক্ করছিলো। না জানি কখন হামলা দিয়ে তার সব লুটে নেবে।

আজ ক'দিন হলো তাই মহব্বৎ আলীর মনে স্বস্তি নেই। কোথায় কেমন ভাবে তার ভেজাল ঔষধের বাক্সগুলি লুকিয়ে রাখবে সেই চেষ্টা করছে।

এমন সময় পুনরায় হংকিং আর মংলাকে দেখে বিস্ময় জেগেছিলো মহব্বৎ আলীর কারণ টাকা—পয়সা সম্পূর্ণ সেদিন নিয়েই বিদায় হয়েছিলো ওরা।

আজ আবার হংকিং আর মংলাও এসে হাজির হলো দেখে মহব্বৎ আলী স্তম্ভিত হয়ে পড়লো।

গোল টেবিলের পাশে বসে পড়লো মংলাও আর হংকিং। মহব্বৎ আলীর চোখ—মুখে বিস্ময় ঝরে পড়ছে। বললো মহব্বৎ আলী—কি ব্যাপার, আবার যে আপনারা ফিরে এলেন?

ডক্টর হংকিং রাগত কণ্ঠে বললেন—তার মানে? আপনি কি চান আমরা আর ফিরে না আসি?

মংলাও বলে উঠলো—আমরা না এলেই খুশী হতেন আপনি?

মহব্বৎ আলী কেমন যেন অবাক হয়ে পড়লো। ডক্টর হংকিং আর মংলাও এর কথাবার্তা যেন বুঝতে পারছেনা সে। বললো মহব্বৎ আলী—আপনারা সেদিন আমার নিকট থেকে টাকা নিয়ে যাবার সময় তো সেই কথাই বলেছিলেন, কান্দাই আর আপনারা আসবেন না।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে উঠলো হংকিং—কি বললেন মহব্বৎ আলী খাঁ! আমরা টাকা নিয়ে গেছি?

হাঁ সেদিন পঁচিশে আগষ্ট রাত্রি এগারোটায় —এরই মধ্যে ভুলে গেছেন সব?

মহব্বৎ আলীর কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো হংকিং রাও আর মংলাও এর মুখমন্ডল। বললো উভয়ে এক সংগে—কি বললেন আপনি!

হংকিং বললো আবার—আমরা টাকা নিয়েছি।

হাঁ নিয়েছেন।

যে লোক দু'জন ঔষধের বাক্স গুছিয়ে রাখছিলো, তারা উভয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে নিলো।

প্রথম মজুর বললো—হুজুর, কাজ হয়ে গেছে।

বেশ এখন বাইরে যাও। আমি এসে তোমাদের মজুরীর দাম দেবো বেরিয়ে গেলো মজুরদ্বয়।

মহব্বৎ আলী রাগত কণ্ঠে বললো—সেদিন সম্পূর্ণ টাকা আপনারা আমার কাছ থেকে বুঝে নিয়ে গেছেন।

হংকিং দৃঢ় গলায় বললো—আমরা আসি নাই, টাকা কি করে নিলাম?

আমি স্বয়ং আপনাদের হাতে টাকা দিয়ে দিয়েছি।

এতো বড় মিথ্যা কথা বলছেন------হংকিং মহব্বৎ আলীর কলার চেপে ধরেলো।

শুরু হলো প্রচন্ড ধস্তাধস্তি।

অল্পক্ষণের মধ্যে হোটেলের লোকজন সবাই ছুটে এলো সেই কক্ষে।

❑

এদিকে যখন মহব্বৎ আলীর সঙ্গে ডক্টর হংকিং ও মংলাও এর তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়েছে তখন পুলিশ অফিসের দরজায় এসে থামলো একটা গাড়ী।

অফিসে তখন অন্য আর একটা ব্যাপার নিয়ে অত্যন্ত চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর আহম্মদ সাহেব ও অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণের মুখমন্ডল আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। কারণ কিছু পূর্বেই একখানা চিঠি এসে পৌঁছেছে মিঃ আহম্মদের হস্তে। চিঠিখানা লিখেছেন স্বয়ং মিঃ জাফরী।

আহম্মদ সাহেব গম্ভীর উৎকুন্ঠা ভাব নিয়ে পায়চারী করছেন। এখনও তার হাতের মুঠায় মিঃ জাফরীর হস্তের চিঠিখানা রয়েছে।

অন্যান্য পুলিশ অফিসারগণ, সকলের মুখেই আতঙ্ক ভাব। সবাই তাকিয়ে আছে মিঃ আহম্মদ সাহেবের মুখের দিকে। এটা একটা ভয়ঙ্কর খবর। মিঃ জাফরীর মত দক্ষ পুলিশ ইন্সপেক্টার বন্দী হবেন দস্যু বনহুরের হস্তে—একথা যেন কেউ বিশ্বাস করতে পারছেন না।

কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় কি! চিঠিখানা যে স্বয়ং মিঃ জাফরী লিখেছেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। পায়চারী বন্ধ করে দাঁড়িয়ে পড়লেন আহম্মদ সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন—এখন কি করা কর্তব্য বলুন?

মিঃ আহম্মদ সাহেবের কথায় পুলিশ অফিসারগণ সবাই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিলেন।

এক পাশে বসেছিলেন মিঃ শঙ্কর রাও। তিনি বললেন—ওঃ এবার দস্যু বনহুর দেখছি আচ্ছা চাল চেলেছে। মিঃ জাফরীও তাঁর সহকারীকে আটক করে আফগানীর মুক্তি চেয়েছে, নাহলে তাঁদেরও মুক্তি নেই।

মিঃ শঙ্কর রাও এর কথা শেষ হতে না হতে একটা লোক ব্যস্তভাবে পুলিশ অফিসে প্রবেশ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো— স্যার পুলিশ ফোর্স নিয়ে তাড়াতাড়ি চলুন। গুলবাগ হোটেলের গোপন একটা কক্ষে বহু ভেজাল ঔষধ বেরিয়েছে। বিলম্ব হলে সব লুকিয়ে ফেলতে পারে।

লোকটা অপরিচিত হলেও তার কথা অবিশ্বাস করবার মত কিছু ছিলনা। কারণ, আহম্মদ সাহেব জানেন—মহব্বৎ আলী গোপনে ঔষধের কারবার করছেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ অভাবে এতোদিন মহব্বৎ আলীকে গ্রেফতার করতে পারেননি বা তার হোটেলখানা তল্লাসী করতে পারেননি।

পুলিশ অফিসের অন্যান্য অফিসারগণ এক একজন এক এক রকম প্রশ্ন করে চললেন লোকটিকে।

মিঃ আহম্মদ সবাইকে চুপ থাকতে বলে লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে এবং আপনার বাড়ী কোথায়?

লোকটা মাথা চুলকে তাকালো আহম্মদ সাহেবের মুখের দিকে তারপর সবাই এর মুখে তাকিয়ে বললো লোকটা —আমি গুলবাগ হোটেলেই কাজ করি। আপনারা কি আমাকে চেনেন না? আমিই তো বয় সাহাদৎ মিয়া? স্যার, গুলবাগে যারা যান সবাই আমাকে চেনেন।

মিঃ আহম্মদ অত্যন্ত সতর্ক লোক, তিনি একজন পুলিশকে বললেন—একে এরেষ্ট করো।

আমাকে! লোকটা কেঁদেই ফেললো যেন।

মিঃ আহসান থানার বড় দারোগা, তিনি বললেন—স্যার, একে এ্যারেষ্ট করা কি ঠিক হবে। তার চেয়ে ওকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলুন ঘটনা সত্য হলে মুক্তি পাবে আর যদি মিথ্যা হয় তাহলে এর উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হবে।

হাঁ, তাই হোক। বললো লোকটা।

মিঃ আহম্মদ পুলিশ ফোর্স নিয়ে তখনই রওয়ানা দিলেন।

মিঃ আহম্মদ ও আরও একজন পুলিশ ইন্সপেক্টার এবং সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স নিয়ে ছুটলেন গুলবাগের উদ্দেশ্যে।

তখনও হোটেল গুলবাগে মহব্বৎ আলী এবং ডক্টর হংকিং আর মংলাও এ তুমুল কলহ চলেছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত লড়াই শুরু হয়ে গেছে।

মহব্বৎ আলীর লোক ডক্টর হংকিং আর মংলাকে খুব করে উত্তম মধ্যম দেওয়া আরম্ভ করে দিয়েছে।

ঠিক সেই সময় মিঃ আহম্মদ পুলিশ ফোর্স নিয়ে হাজির হলেন হোটেল গুলবাগে।

যে ব্যক্তি মিঃ আহম্মদকে পুলিশ অফিসে গিয়ে সংবাদ দিয়েছিলো। সে মিঃ আহম্মদ ও পুলিশ ফোর্সকে হোটেল পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

মিঃ আহম্মদ পুলিশ ফোর্স নিয়ে হোটেল—কক্ষে প্রবেশ করতেই মহব্বৎ আলী ও ডক্টর হংকিং আর মংলা চুপ হয়ে পড়লো।

এবার সেই লোকটি মিঃ আহম্মদকে দেখিয়ে দিলো যেখানে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো ভেজাল ঔষধের বাক্সগুলি। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ অসংখ্য ভেজাল ঔষধের বাক্স আবিস্কার করে ফেললো।

মিঃ আহম্মদের ইংগিতে মহব্বৎ আলী আর ডক্টর হংকিং রাও ও ডক্টর মংলাকে এরেষ্ট করে ফেললো পুলিশ বাহিনী।

শুধু মহব্বৎ আলী এবং ডক্টর হংকিং রাও আর মংলাওকেই পুলিশ বাহিনী বন্দী করলোনা, সমস্ত হোটেলের কর্মচারীগণকে এরেষ্ট করা হলো।

হংকিং রাও আর মংলাও দস্যু বনহুর হস্তে বন্দী থাকার পর সবে মাত্র মুক্তি পেয়েছিলো আবার তারা বন্দী হয়ে নিজেদের কর্মদোষ মর্মে মর্মে অনুভব করতে লাগলো।

মহব্বৎ আলীর মাথায় সহসা আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও সে এতোখানি আঘাত পেতোনা। চেখে অমাবস্যার অন্ধকার দেখতে লাগলো মহব্বৎ আলী। তার এতো পরিশ্রমের উপার্জিত অর্থ আর ঔষধগুলি বিনষ্ট হলো। ইতিপূর্বে অন্যান্য ব্লাকমার্কেট ব্যাপারে কয়েকবার জেল খেটেছে সে কিন্তু এতেও ভেংগে পড়েনি মহব্বৎ আলী কোনদিন। আজ তার সব গেলো শুধু অর্থই নয়—তার সঙ্গে গুলবাগ হোটেলও বন্ধ হয়ে গেলো।

মিঃ আহম্মদ বন্দীদের নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে বসলেন।

নানা ব্যস্ততার মধ্যে এতোক্ষণ মিঃ আহম্মদ ও তাঁর অন্যান্য সহকারীগণ ঐ ব্যক্তিটির প্রতি নজর রাখতে পারেননি বা নজর রাখার প্রয়োজনও বোধ করেননি। কারণ তার কথা মিথ্যা নয়। এর পূর্বে অনেক অনুসন্ধান করেও এই ভেজাল ঔষধ কোথা হতে শহরে আমদানী হয় এর খোঁজ পায়নি পুলিশ মহল! আজ সেই ভেজাল ঔষধের পরিবেশক মহব্বৎ আলীকে এবং তার সমস্ত ঔষধ আবিস্কার করায় দেশ ও দশের একটা মহান উপকার সাধিত হলো।

মিঃ আহম্মদ গাড়ীতে বসে বললেন—উনি কই, যিনি আজ আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এলেন, সেই অজ্ঞাত ব্যক্তি কই?

কিন্তু কোথায় সেই ব্যক্তি! অনেক সন্ধান করেও আর তাকে দেখা গেলো না।

❑

নির্জন বনপথ দিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলেছে দু'জন অশ্বারোহী। উভয়েরই শরীরে একই ড্রেস। কালো পোষাক মাথায় কালো পাগড়ী, গালপাট্টা বাঁধা, পিঠে রাইফেল ঝুলছে।

অসংখ্য বৃক্ষের পাতার ফাঁকে নীল আকাশের কিছু কিছু অংশ নজরে পড়ছে।

হাল্কা মেঘের ফাঁকে দ্বাদশীর চাঁদ লুকোচুরি খেলছে। মৃদু—মন্দা বাতাস দোলা দিয়ে যাচ্ছে শাখায় শাখায়। মাঝে মাঝে রাতজাগা পাখীগুলি পাখা ঝাপটা দিয়ে উঠছে।

রাত খুব বেশী না হলেও নির্জন বনাঞ্চলে গভীর রাত বলেই মনে হচ্ছিলো।

অশ্বরোহীদ্বয় আপন মনে কথা বলতে বলতে চলেছে।

প্রথম জন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান পুলিশ অফিসের কেউ চিনতে পারেনি শেষ পর্যন্ত?

বললো দ্বিতীয় জন—না সর্দার, আমাকে পুলিশ অফিসের কেউ চিনতে পারেনি, মিঃ আহম্মদও নয়।

তোমার বুদ্ধি কৌশলে আমি খুশী হয়েছি রহমান।

সর্দার, আমাকে ইতিপূর্বে মিঃ আহম্মদ কিংবা পুলিশ অফিসারগণ কেউ দেখেননি, সেই কারণেই আমি এতো সহজে কাজ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়াও আমার মুখে ছিলো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর মুখ ভরা বসন্তের দাগ। আমার শরীরে রঙ ও প্যান্টে নিয়েছিলাম নিখুঁতভাবে।

মহব্বৎ আলী ও তার দলবলকে গ্রেপ্তারের পরেই তুমি সরে পড়েছিলে?

হাঁ সর্দার, আপনি যে ভাবে বলে দিলেছিলেন সেই ভাবেও কাজ করেছি। আচ্ছা সর্দার, আপনি কি ঐ সময়--

হাঁ, আমি ঐ সময় মহব্বৎ আলীর লৌহ সিন্দুকের পাশে ছিলাম। পুলিশ সমস্ত হোটেল হস্তগত করার পূর্বেই সম্পূর্ণ অর্থ আমার হস্তগত হয়েছিলো। আমি যখন হোটেলের বাইরে এসে পৌঁছেছিলাম ঠিক তখন মিঃ আহম্মদ ও পুলিশ ফোর্স মহব্বৎ আলী আর তার বিশ্বস্ত অনুচরদের পাকড়াও করে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে বসেছিলো। তখন আমি তোমাকে লক্ষ্য করেছিলাম, কিন্তু দেখতে পাইনি।

তার পূর্বেই আমি সরে পড়তে সক্ষম হয়েছিলাম সর্দার।

আফগানীর মুক্তি দিয়েছে কি? প্রশ্ন করলো বনহুর।

রহমান বললো—কায়েস এখন পুলিশের হেড অফিসে, আফগানী সাহেব ছাড়া পেলে নিশ্চয়ই সে বিলম্ব না করে সংবাদ দিতো।

দস্যু বনহুর আর রহমান এবার ঘোড়া ছুটিয়ে আস্তানার পথে অগ্রসর হলো।

আস্তানায় পৌঁছতেই দু'জন মশালধারী অনুচর এসে বনহুর আর রহমান-এর দুই পাশে দাঁড়ালো।

বনহুর আর রহমান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো। সম্মুখে এসে দাঁড়ালো কায়েস।

বনহুর আর রহমান—তাকালো কায়েসের দিকে।
বললো রহমান—কায়েস, তুমি কখন এলে?
কায়েস বললো—সন্ধ্যার কিছু পর আস্তানায় এসে পৌঁছেছি।
কি সংবাদ কায়েস? বললো বনহুর।
সর্দার আফগানী সাহেবকে হাজত থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
আফগানী সাহেব মুক্তি লাভ করেছে তাহলে?
হাঁ সর্দার।
এবার তাহলে মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেনকে মুক্তি দিতে হয়। বললো রহমান।
বনহুর আস্তানার দিকে এগুতে এগুতে বললো—মিঃ আহম্মদ অতি বুদ্ধিমান লোক। সহজাত ভাই এর জন্য তিনি মস্ত চাল চাললেন।
দু'জন অনুচর একজন তাজকে অন্যজন দুলকীকে নিয়ে চলে গেলো ওদিকে।
রহমান আর বনহুর পাশাপাশি এগুচ্ছিলো। পিছনে চলেছিলো কায়েস।
বনহুরের কথায় রহমান বললো —সর্দার, আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না?
ও, আচ্ছা চলো, বিশ্রাম কক্ষে বসে কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।
বনহুর রহমান আর কাছে এসে হাজির হলো বনহুরের বিশ্রাম কক্ষে।
বনহুর পিঠে ঝোলানো রাইফেলটা খুলে দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলো। মাথায় পাগড়ীটা খুলে রাখলো সামনের টেবিলে। তারপর শয্যায় ঠেস দিয়ে বসলো —বসে রহমান।
রহমান পিঠের রাইফেলটা খুলে দক্ষিণ হস্তে ধরে বসে পড়লো পাশের একটা পাথরখন্ডে।
বনহুরের আস্তানাটা ছিলো সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী কাজেই পাথরের কোন অভাব ছিলোনা তার আস্তানার কোন স্থানে। কক্ষমধ্যে এবং আনাচে কানাচে বিক্ষিপ্ত ছড়ানো ছিলো অসংখ্য পাথর—কালো সাদা ছোট বড় নানাধরনের।
রহমান এরই একটিতে বসলো।
কায়েস দাঁড়িয়ে রইলো তাদের সামনে।
বনহুর বললো—আহম্মদ সাহেব মিঃ জাফরী ও হোসেনের মুক্তির জন্যই আফগানীকে মুক্তি দিয়েছে, তাই না?
হাঁ সর্দার, মিঃ জাফরীর চিঠি পেলেই তিনি এই মত কাজ করেছেন।
বললো বনহুর—কিন্তু এর পিছনে রয়েছে বিরাট একটা অভিসন্ধি। মিঃ আহম্মদ মিঃ জাফরী ও তার সহকারীকে ফিরে পেলেই আবার আফগানীর উপর হামলা চালাবে।

ঐরকম আমারও মনে হয় সর্দার। বললো কায়েস।

রহমান তাকলো কায়েসের দিকে।

বনহুর বললো—শুধু আফগানী নয়, ঐ মিঃ জাফরীকে পেলে মিঃ আহম্মদ নবোদ্যমে আবার আমার পিছু লাগবে।

তাহলে ---কথা শেষ না করে চুপ হয় রহমান।

কায়েস বলে উঠে—মিঃ জাফরীকে মুক্তি না দেওয়াই আমি সমীচিত মনে করি।

বনহুর মৃদু হাসলো—মিঃ জাফরীকে আটক করে রাখলে পুলিশ মহল আরও ক্ষেপে যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। যদিও তারা আমার আস্তানা খুঁজে বের করতে কোনদিন সক্ষম হবেনা, কিন্তু আফগানী সাহেবকে তারা কঠিন শাস্তি দেবে। আহম্মদ সাহেব জানেন—আমি আফগানীকে সমীহ করি।

রহমান আর কায়েস নীরবে শুনে যাচ্ছিলো বনহুরের কথাগুলো।

বনহুর বলতে লাগলো—আজ ভোর হবার পূর্বেই মিঃ জাফরী ও তার সহকারীকে পুলিশ অফিসে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করো। হাঁ, তার পূর্বে মিঃ জাফরীর সঙ্গে আমার দেখা করার দরকার। বনহুর দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো। রাত দুটো বাজতে কয়েক মিনিট বাকী।

উঠে দাঁড়ালো বনহুর। রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—চলো বন্দীখানায় যাবো।

বনহুরের সঙ্গ অগ্রসর হলো রহমান আর কায়েস।

সুদীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে এগিয়ে চললো তারা।

সুড়ঙ্গের মাঝে মাঝে মশাল জ্বলছে। একটানা কিছুদূর অগ্রসর হয়ে, মস্ত বড় একটা চাকার মত জিনিস রয়েছে। রহমান চাকার হ্যান্ডেল ধরে ঘুরাতেই একটা মুখ বেরিয়ে এলো ঠিক কুমীরের মুখের মত দরজাটা। এবার বনহুর আর রহমান সেই পথে অগ্রসর হলো।

বনহুর থমকে দাড়িয়ে বললো—কায়েস, তুমি তাজ আর দুলকীকে প্রস্তুত রেখো, আরও দুটো অশ্ব রাখবে।

আচ্ছ সর্দার।

কায়েস দাঁড়িয়ে রইলো, বনহুর আর রহমান প্রবেশ করলো সেই কুমীরের মুখাকৃতির মধ্যে।

ওদিকে কোন আলো ছিলোনা, রহমান এপাশ থেকে একটা মশাল তুলে নিলো হাতে।

আরও অন্ধকার এবং দুর্গম এই সুড়ঙ্গপথ। বহুদিন আগে একদিন বনহুর মনিরাকে মুরাদের হাত থেকে উদ্ধার করে এখানেই এনে

রেখেছিলো, এই পথ বেয়ে আসতে গিয়েই সেদিন মনিরা দু'চোখ বন্ধ করে বনহুরকে আকড়ে ধরেছিলো ভয়ে। সুড়ঙ্গপথটা অতি সঙ্কীর্ণ এবং অন্ধকার। নীচে খরস্রোত একটি জলপ্রপাত।

বনহুর আর রহমান এই পথে অগ্রসর হলো।

সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করে ওপারে এসে পৌঁছলো। এটাই হলো বনহুরের কারাকক্ষের সীমানা।

ওদিকে একট মস্ত কপাট। ওপাশে কি আছে এপাশ থেকে বুঝবার জো নেই। কপাটের গ্যায়ে বিরাট একটা তালা।

রহমান মশালটা কপাটের এক পাশে গেড়ে রেখে চাবির গোছা বের করলো।

কপাট খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো বনহুর আর রহমান।

একটি গোলাকার কক্ষ, কক্ষমধ্যে একটা গোলকার টেবিল। টেবিলে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্র এবং নানা রকম আমোদ—প্রমোদের বা খেলাধূলার সরঞ্জাম।

এ কক্ষে বনহুরের অনুচরগণ কখনও কখনও আনন্দ উপভোগ করে।

বনহুর আর রহমান পৌছতেই বিশ জন দস্যু—বলিষ্ঠ ভয়ঙ্কর চেহারা, হাতে মারাত্মক অস্ত্র—কুর্নিশ করে দাঁড়ালো।

এরা বনহুরের কারাকক্ষের পাহারাদার। বাইরের আলো—বাতাসের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। এদের সুখ—সুবিধার জন্য বনহুর ভূগর্ভেই সব কিছুর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরা ইচ্ছামত বাইরে যেতে পারে না বা কোন সময় যাবার জন্য আগ্রহ দেখায় না। বছরে পাঁচদিন এরা ছাড়া পায়, তখন এরা ভূপৃষ্ঠে গমন করে যা খুশী তাই করে। বনহুর এদের কাজে তখন বাধা দেয় না।

বনহুর আর রহমান গোলাকার কক্ষ পেরিয়ে এগিয়ে গেলো। ওদিকেও আর একটা কপাট। এটার চাবি ছিলো ভূগর্ভস্থ এক অনুচরের নিকটে। সেই অনুচরটি এ তালা খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে পাশাপাশি কয়েকখানা কক্ষ নজরে পড়লো। উজ্জ্বল আলোতে কক্ষগুলি আলোকিত। প্রতি কক্ষে কয়েকজন বন্দী আটক রাখা হয়েছে।

বনহুর আর রহমান এগিয়ে গেলো ওদিকে একটা বড় কক্ষে। এ কক্ষটাও আলোতে উজ্জ্বল।

এ আলোগুলো সূর্যের আলো নয়, বৈদ্যুতিক আলো। ভূগর্ভে খরস্রোত জলপ্রাপাত থেকে বৈদ্যুতিক আলো আমদানী করা হয়েছে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেন উঠে এগিয়ে এলেন।

বনহুর আর রহমান এসে দাঁড়ালো তাদের সম্মুখে।

বললো বনহুর—মিঃ জাফরী, আপনার চিঠি পেয়ে মিঃ আহম্মদ আফগানী সাহেবকে মুক্তি দিয়েছে এবার আপনারা মুক্তি পাবেন।

বনহুরের কথায় মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বললেন মিঃ জাফরী—তাহলে বিলম্ব না করাই শ্রেয় দস্যু সম্রাট।

বনহুর হেসে উঠলো—এক মুহূর্ত আর বিলম্ব সইছেনা ইন্সেপেক্টার, কিন্তু মনে রাখবেন, আবার যদি আফগানীর উপর কোন --

না, আমি কথা দিচ্ছি আফগানীর উপর আর কোন শাস্তি প্রদান করা হবেনা। কিন্তু একটা কথা আমি বলবো দস্যু, রাখবে বলো? বলেন মিঃ জাফরী।

রাখবার মত হলে রাখবো বৈকি। বললো বনহুর।

মিঃ জাফরী বললেন—তোমার এই ভূগর্ভ আস্তানাটা একবার স্বচক্ষে দেখতে চাই।

অট্টহাসি হেসে উঠলো বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ, আমার ভূগর্ভ আস্তানাটা দেখতে চান? বেশ, রহমান, উনাদের নিয়ে এসো আমার সঙ্গে।

বনহুর এগুলো।

রহমান মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন সহ অনুসরণ করলো বহুরকে।

বনহুর একটা মস্তবড় লৌহ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালো। রহমান দেয়ালের এক পাশে চাপ দিতেই দরজা খুলে গেলো। গাঢ় জমাট অন্ধকারের মধ্যে যেন একটা মরণ—বিভীষিকা প্রতীক্ষা করছে।

বনহুরের ইংগিতে একটা মশাল নিয়ে এলো রহমান।

মশাল হস্তে রহমান সর্বাগ্রে প্রবেশ করলো। পিছনে বনহুর মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেন।

এটাও একটা সুড়ঙ্গ পথ।

বনহুর বললো—ইন্সপেক্টার এটা আমার আস্তানায় প্রবেশ পথ।

সুড়ঙ্গ পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়ার পর একটা শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। কোন যন্ত্র চলার শব্দ বলে মনে হলো যেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই নজর পড়লো—বিরাট একটা চাকা ঘুরছে। চাকাটার চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে অসংখ্যা আগুনের ফুলকী। চার পাশে আরও অগণিত ছোটবড় মেশিন চলছে। অবাক হয়ে দেখলেন মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন—শুধু মেশিনই নয়, প্রত্যেকটা মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করছে বলিষ্ঠদেবী পুরুষ।

বনহুর বললো—ইন্সপেক্টার, এটা আমার অস্ত্র তৈরীর কারখানা। এখানে নানা রকম অস্ত্র তৈরী হয়ে থাকে।

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের চোখে—মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, মিঃ জাফরীর ধমনীর রক্ত উষ্ণ হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে, কিন্তু এই মুহূর্তে নীরব থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই। মিঃ জাফরী একবার সহকারী হোসেনের দিকে তাকিয়ে নিলেন বনহুরের অজ্ঞাতে।

বনহুর এবার দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করলো। রহমান, মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন তাকে অনুসরণ করলো!

দ্বিতীয় কক্ষে প্রবেশ করে বিস্ময়ে স্তব্ধ হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয়! কক্ষটায় অসংখ্য অস্ত্র স্তুপীকৃত রয়েছে।

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন আবার দৃষ্টি বিনিময় করলেন। উভয়েরই চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠেছে।

বনহুর বললো—এটা আমার অস্ত্রাগার।

ইন্সপেক্টারদ্বয় স্তম্ভিত হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন—কক্ষমধ্যে স্তুপাকৃত ছোরা তলোয়ার, বর্শা, তীর-ধনু—এমন কি বন্দুক-রাইফেল অসংখ্য রয়েছে। কান্দাই এর কোন গোপন অঞ্চলে এমন একটা অস্ত্রাগার আছে কেউ আজও কল্পনা করতে পারবে না।

বনহুর রহমানকে ইংগিৎ করলো কিছু।

রহমান অস্ত্রগারের মেঝেতে পা দিয়ে এক স্থানে চাপ দিলো সঙ্গে সঙ্গে মেঝের এক পাশের কিছুটা অংশ ফাঁক হয়ে একটা সিঁড়ি মুখ বেরিয়ে এলো।

বনহুর বললো—ইন্সপেক্টার, আসুন।

সর্বাগ্রে বনহুর সিড়ির ধাপে পা রাখলো।

সিড়ি বেয়ে অগ্রসর হলো সে। মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন ইতস্তত করছিলেন দেখে বললো বনহুর —আসুন, কোন ভয় নেই।

মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন ও রহমান সিড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলো।

পাতাল গহ্বরে সিড়ির ধাপ বেয়ে আরও নীচে নামতে লাগলো তারা।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বনহুর দাঁড়িয়ে পড়লো। একটা মাঝারি ধরনের কক্ষ এ কক্ষে নানা রকম গোলা বারুদ থরে থরে সাজানো রয়েছে।

কক্ষটার মধ্যে বারুদের গন্ধ নাকে এসে লাগছিলো।

বললো বনহুর—এটা আমার গোলা-বারুদ মজুদ কক্ষ। ইন্সপেক্টার, গোটা কান্দাই শহর ধ্বংস হবে, এতো গোলা—বারুদ মজুত রয়েছে আমার।

মিঃ জাফরী কোন জবাব না দিয়ে একবার মিঃ হোসেনের দিকে তাকিয়ে নিলেন। দক্ষ পুলিশ ইন্সপেক্টার তিনি, একজন দস্যুর এতো খানি

আধিপত্য লক্ষ্য করে ভিতরে ভিতরে ভীষণ ক্রুদ্ধ হচ্ছিলেন। এই মুহূর্তে ইচ্ছা হচ্ছিলো—বনহুরকে তিনি বন্দী করেন। কিন্তু তিনি নিজেই এখন দস্যু হস্তে বন্দী, কাজেই মনের রাগ মনেই চেপে গেলেন।

বনহুর তার সমস্ত আস্তানায় গোপন স্থানগুলি এক এক করে দেখালো পুলিশ ইন্সেপেক্টার মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনকে।

এমনকি তার বিশ্রামকক্ষ ও তার দরবারকক্ষও দেখালো।

মিঃ জাফরীর চোখে—মুখে রাজ্যের বিস্ময়। দস্যু বনহুরকে যতই ঘৃণা করুক যতই তার উপর রাগ থাক তবু অন্তরে অন্তরে দস্যু বনহুরের বিরত্বের প্রশংসা না করে পারলেন না। ভুগর্ভে এতো থাকতে পারে কল্পনা করতে পারেন না তাঁরা। মিঃ জাফরীর পুলিশ জীবনে এই তিনি প্রথম দেখলেন—একজন দস্যু ভূগর্ভে কতখানি নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কবে কখন কি উপায়ে যে এতো করতে পেরেছে, ভেবে অবাক না হয়ে পারলেন না মিঃ জাফরী।

এতোক্ষণ নীরবে সব দেখে গেলেন, মনে মনে বিস্ময়ের শেষ সীমায় পৌঁছলেও এতোক্ষণ একটি কথাও তিনি উচ্চারণ করেননি।

মিঃ হোসেনও নির্বাক নয়নে সব দেখে যাচ্ছিলেন মনে প্রশ্ন জাগলেও একটি কথা তার মুখেও সরছিলো না।

বনহুর ইন্সপেক্টারদ্বয়ের মনোভাব বুঝতে পারছিলো। মৃদু মৃদু হাসছিলো সে, বললো এবার —আমার সব কিছুই বন্ধু বলে আপনাকে দেখালাম ইন্সপেক্টার, কিন্তু মনে রাখবেন—আমার সঙ্গে কোন রকম চাতুরী খেলতে যাবেন না।

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন কোন কথা বললেন না।

বনহুর বললো আবার -ইন্সপেক্টার আপনারা বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন বসুন কিছু পান—আহার করা যাক। বসুন।

অগত্যা বনহুরের কথা রাখতে হলো ইন্সপেক্টর দ্বয়কে।

একটা টেবিলের পাশে এসে বসলো বনহুর ও মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন।

নানাবিধ ফলমূল আর পানীয় সাজিয়ে রেখে গেলো একজন অনুচর।

রহমান পরিবেশন করে খাওয়াতে লাগলো।

না খেয়ে তো কোন উপায় নেই, আজ কত দিন দস্যু বনহুরের আস্তানায় তারা বন্দী হয়ে আছেন—জীবন রক্ষার্থে খাদ্যগ্রহণ করতেই হয়েছে। মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন—তাদের রুচিমত খাদ্যই বনহুর তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। বরং আরও ভাল পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা হতো তাঁদের জন্য।

কাজেই আজ খেতে তাঁদের কোন আপত্তি থাকতে পারে না। বনহুর স্বয়ং মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের সঙ্গে খেতে শুরু করলো।

পরিচ্ছন্ন সুন্দর, খাবার, টাটকা ফলমূল, গরম দুধ—সব ছিলো টেবিলে। একটা বড় রেকাবীতে থরে থরে সাজানো ছিলো থোকা থোকা আঙ্গুর ফল।

বনহুর রেকাবী থেকে আঙ্গুরের একটা থোকা তুলে নিয়ে মুখে ধরলো, কয়েকটা আঙ্গুর এক সঙ্গে চিবুতে চিবুতে বললো—আজ রাতেই আপনারা ফিরে যাবেন ইন্সপেক্টার। আপনাদের আদর —যত্ন ঠিকভাবে করতে পারলাম না এজন্য মাফ করবেন না?

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন বনহুরের কথায় খুশী হলেন না। বরং রাগ হলো তাদের অন্তরে। কারণ তাঁদের আদর—যত্নের কোন ত্রুটি হয়নি এখানে। দস্যুর হস্তে বন্দী হয়ে এতো লৌকিকতা ভাল লাগছিলো না এর চেয়ে নির্মম আচরণই তাদের মনে একটা শান্তি দিতো।

মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন দুধপান শেষ করে রুমালে মুখ মুছলেন।

বনহুরও দুধের গেলাসটা হাতে তুলেছিলো, এক নিশ্বাসে দুধ পান করে খালি গেলাসটা নামিয়ে রাখলো টেবিলে।

প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট কেসটা বের করে বাড়িয়ে ধরলো বনহুর মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেনের সামনে।

মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেন সিগারেট না নিয়ে পারলেন না।

বনহুর নিজে একটা সিগারেট ঠোঁটে চেপে ধীরে তাতে অগ্নি সংযোগ করলো।

সিগারেটের ধোঁয়ার ফাঁকে বনহুর তাকাচ্ছিলো মাঝে মাঝে ইন্সপেক্টারদ্বয়ের মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হলো। কিছুতেই নিজেদের সংযত রাখতে পারছেন না তারা। একটা গভীর আবেশে মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেন এক সময় ঢলে পড়লেন নিজ নিজ আসনে।

বনহুরের আদেশে ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী আর মিঃ হোসেনের সংজ্ঞাহীন দেহ কাঁধে তুলে নিলো কয়েকজন অনুচর।

রহমান ও বনহুর অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসলো।

মিঃ জাফরীর সংজ্ঞাহীন দেহটা বনহুর নিজের অশ্বে তুলে নিলো। আর মিঃ হোসেনকে তুলে দেওয়া হলো রহমানের অশ্বপৃষ্ঠে।

বনপথে দ্রুত অগ্রসর হলো বনহুর আর রহমান।

উভয়ের অশ্বপৃষ্ঠে দুই জন ইন্সপেক্টার।

❑

মিঃ জাফরীর ঘুম ভাঙতেই বিস্ময়ে আরষ্ট হলেন তিনি। একি! তার বিছানার চারপাশে এতো লোকজন কেনো! সবার আগে নজর পড়লো পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহম্মদের মুখে।

মিঃ জাফরীকে চোখ মেলতে দেখেই বললেন মিঃ আহম্মদ—মিঃ জাফরী, আপনি কি সুস্থ্ বোধ করছেন?

হাঁ, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ্ রয়েছি। কিন্তু আমি এখন কোথায় ঠিক স্মরণ করতে পারছিনা।

আপনি আপনার নিজ বাসায় এবং নিজ বিছানায়।

এখানে কি করে এলাম আমি?

এখন নয়, পরে সব জানতে পারবেন।

না; আপনারা সব খোলাসা বলুন? আমি বললাম তো, কোনরূপ অসুস্থ্ই আমি নই। মিঃ জাফরী শয্যায় উঠে বসলেন।

মিঃ আহম্মদ বললেন—আপনি এখন যে ভাবে শুয়ে ছিলেন ঠিক সেই ভাবেই আপনার স্ত্রী আপনাকে আপনার শয্যায় দেখতে পেয়েছিলেন।

আমার শয্যায়?

হাঁ।

আশ্চর্য। মিঃ জাফরী গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতে লাগলেন। একটু পরে বললেন—মিঃ হোসেন কোথায়?

তাঁকে তো এখনও পাওয়া যায়নি-- মি আহাম্মদের কথা শেষ হয়না, টেবিলে ফোনটা সশব্দে বেজে উঠে ক্রিং ক্রিং করে।

অন্য একজন ভদ্রলোক রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানে ধরলেন—হ্যালো! হাঁ কি বললেন, মিঃ হোসেনকে পাওয়া গেছে! কোথায় বললেন? হ্যালো—হ্যালো —কি? তাঁর গ্যারেজে রাখা গাড়ীর মধ্যে? আশ্চর্য রিসিভার রেখে বললেন ভদ্রলোক।

মিঃ আহম্মদ বললেন—আশ্চর্য নয়, তাকে যে এমনভাবে পাওয়া যাবে, বোঝাই যাচ্ছিলো।

মিঃ জাফরী এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হলেন, বললেন তিনি—দস্যু বনহুর তাহলে তার কথা এ ভাবেই রাখলো।

মিঃ আহম্মদ বললেন —না রেখে কি উপায় আছে। সে জানে—মিঃ জাফরী ও তার সহকারীর কোন অমঙ্গল হলে আবার আফগানী সাহেবের উপর আমাদের আক্রমণ চলবে।

অন্য একজন অফিসার বললেন—কাজেই সে পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয়কে নিরাপদে স্বস্থানে পৌছে দিতে বাধ্য হয়েছে।

মিঃ আহম্মদ বললেন—মিঃ জাফরী, বনহুর আপনাদের সজ্ঞানে এখানে পৌছে দেয়নি বুঝতে পারছি।

হাঁ, আমরা জানিনা, কি ভাবে সে আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়েছে। মিঃ আহম্মদ অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে। এখন চলুন মিঃ হোসেন কেমন আছেন—তাকে দেখে আসি।

ব্যস্তভাবে বললেন মিঃ আহম্মদ —এখন আপনার শয্যা ত্যাগ করা ঠিক হবে না মিঃ জাফরী।

না না, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ রয়েছি।

মিঃ জাফরী শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালেন।

মিঃ হোসেনের বাড়ী পৌছে তারা দেখলেন—হোসেন সাহেবের শারীরিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। মিঃ হোসেনও সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন।

তিনি কি ভাবে গ্যারেজে গাড়ীর পিছন আসনে শুয়েছিলেন জানেন না। ড্রাইভার গাড়ী বের করতে গ্যারেজে প্রবেশ করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। ছুটে এসে সংবাদ দিয়েছিলো সে বাড়ীর মধ্যে।

মিঃ আহম্মদ ড্রাইভারকে ডেকে আবার সমস্ত ব্যাপারটা শুনলেন আগাগোড়া।

❑

শুধু পুলিশ মহলই নয়, সমস্ত শহরে কথাটা ছড়িয়ে পড়লো বিদ্যুৎ গতিতে। বিস্ময়ের উপরে বিস্ময় জাগালো সকলের মনে। প্রত্যেকটা অফিসার এসে মিঃ জাফরী ও মিঃ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে লাগছেন। সবাই নানা রকম সহানুভূতি দেখাতে লাগলেন ইন্সপেক্টার দ্বয়কে। দস্যু বনহুর তাদের প্রতি কি ধরণের আচরণ করেছে—সেখানে তারা কেমন ছিলেন—তাদের কি খেতে দিতো—কি ভাবে কি করতো—সব জানার জন্য উদগ্রীব সবাই।

মিঃ জাফরী এবং মিঃ হোসেন সত্য কথাই বললেন।

দস্যু বনহুর তাঁদের প্রতি কোন রকম অসৎ ব্যবহার করেনি, এ কথা জানালেন তারা।

কিন্তু দস্যুর আতিথ্য সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে খুশী হবার বান্দা নন মিঃ জাফরী, ছাড়া পেয়ে ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় হয়ে উঠলেন তিনি। শপথ গ্রহণ করলেন যেমন করে হোক বনহুরকে গ্রেপ্তার না করা অবধি তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করবেন না। মিঃ জাফরী আর মিঃ আহম্মদের মধ্যে সব সময় এ বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে লাগলো।

বনহুরের আস্তানা সম্বন্ধে যা মিঃ জাফরী জানতে পেরেছিলেন এবং স্বচক্ষে দেখেছিলেন সব বললেন মিঃ আহম্মদ সাহেবের নিকটে।

মিঃ আহম্মদের দু'চোখে যেন আগুন ঝরে পড়তে লাগলো। তিনি বললেন—একটা দস্যু কান্দাই এর বুকে এতোখানি আধিপত্য বিস্তার লাভে সক্ষম হয়েছে আর আমরা পুলিশ বাহিনী তার এতোটুকু টিকি আবিস্কার করতে পারলামনা। মিঃ জাফরী,আপনি কি কিছুই অনুমান করতে পারেন না? কান্দাই এর কোথায় কোন স্থানে এই আস্তানা রয়েছে?

না, কিছুতেই আমি বুঝতে পারছিনা—দস্যু বনহুর আমাকে কান্দাই এর কোন পথে কোন দিকে, কোথায় নিয়ে গিয়েছিলো।

আর কোথা হতে কোন পথে রেখেই বা গেলো।

মিঃ জাফরীর কথায় মিঃ আহম্মদের মুখমন্ডল গম্ভীর হয়ে উঠলো, তিনি কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন—এর বিহিত ব্যবস্থা না করে ছাড়ছি না।

মিঃ জাফরীর সঙ্গে গোপনে কিছু আলোচনা করতে লাগলেন তিনি।

সিগারেটের পর সিগারেট নিঃশেষ হতে লাগলো, আর চললো কথোপকথন।

দেয়াল ঘড়িটা টিক্ টিক্ শব্দে এগিয়ে চলেছে।

রাত বেড়ে আসছে ক্রমেই।

মিঃ জাফরীর বাংলোয় বসে আলাপ করছেন মিঃ আহম্মদ, মিঃ হোসেন আর স্বয়ং মিঃ জাফরী।

হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে আসে তাঁদের কানে।

খট্ খট্ খট্ --- খট্ খট্ খট্ -- খট্ --খট্ ---------

মিঃ জাফরী, মিঃ হোসেন কান পেতে শুনতে লাগলেন। মিঃ আহম্মদ সিগারেটটা মুখ থেকে সরিয়ে নিয়ে স্তব্ধভাবে শুনতে লাগলেন, বললেন তিনি—কিসের শব্দ এটা?

মিঃ জাফরীর চোখেমুখে ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠলো, তিনি বললেন— এ শব্দ আমার অতি পরিচিত মিঃ আহম্মদ।

তখনও শব্দটা একেবারে মিশে যায়নি, দূরে সরে গেছে তবু অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে--খট্ খট্ খট্ --শব্দটা।

মিঃ জাফরী বললেন—দস্যু বনহুরের অশ্বপদ শব্দ এটা।

দস্যু বনহুরের?

হাঁ, আমি ইতিপুর্বে আরও অনেক বার শুনেছি এ শব্দ।

মিঃ আহম্মদ বললেন—হুঁ।

শব্দটা কয়েক মিনিটের মধ্যে দূর হতে দুরান্তে মিশে গেলো। কিন্তু তখনও পুলিশ ইন্সপেক্টার এর কানে বনহুরের অশ্বপদ শব্দে প্রতিধ্বনির রেশ লেগে রয়েছে যেন।

মিঃ আহম্মদ হঠাৎ হেসে উঠলেন—হাঃ হাঃ হাঃ দস্যু বনহুর যাদুকর নয়—মানুষ। সেই মানুষকেই আমরা পাকড়াও করতে পারিনা।

❑

স্বামীর কাছে যতই পুত্রশোক ভুলে থাকতে চেষ্টা করুক, আসলে মনিরা মুহুর্তের জন্য নূরকে ভুলতে পারেনি। মনের মধ্যে সদা সর্বদা একটা ব্যথা গুমড়ে কেঁদে ফিরছিলো তার। সব সময় মলিন মুখ-মন্ডল, চোখ ছলছল—যেন বিষাদের প্রতিচ্ছবি।

একদিকে স্বামীর চিন্তা অন্যদিকে পুত্রশোক। তবু যদি সব সময় স্বামীকে পাশে পেতো তাহলেও মনিরা ভুলতে পারতো সব ব্যথা।

স্বামীর সঙ্গ কোন নারী না কামনা করে! পৃথিবীর সব কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন নারী পারে কি তার স্বামীকে ত্যাগ করতে। মনিরা স্বামীর কথা স্মরণ করে ভুলতে চেষ্টা করে পুত্র নুরকে।

প্রতিদিন, প্রতি মুহুর্তে মনিরা স্বামীর চিন্তায় মগ্ন থাকে, কিন্তু সব চিন্তা ছাপিয়ে ভেসে উঠে নূরের কথা তার হৃদয়ের কোণে—তখন মনিরা অস্থির হয়ে পড়ে। নূরের মাধ্যমে সে ভুলতে চেয়েছিলো স্বামীর অভাব। ভুলতে চেয়েছিলো মনিরা জীবনের সব ব্যথা। নূরের কথা মনে হলেই সে আলমারী খুলে বের করে আনে তার জামা —কাপড় আর জুতো—বুকে চেপে ধরে মুখে মাথায় ঠেকায়। চোখ বন্ধ করে কচি হাতের স্পর্শ অনুভব করে। মনিরার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ে তখন অশ্রুধারা।

সেদিন দ্বিপ্রহরে নির্জন কক্ষে নূরের জামা—জুতো বের করে মনিরা নির্বাক নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো আর নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলো।

মরিয়ম বেগম পাশের ঘরে একটু ঘুমিয়েছেন।

দাসদাসীগণ তাদের বিশ্রাম স্থানে বিশ্রাম করছে। সরকার সাহেব বাইরের কোন কাজে বেরিয়ে গেছেন।

নকীব বাইরের গেটটা বন্ধ করে উঠানে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো এমন সময় এক বৃদ্ধ ভিখারী—গলায় তসবী হাতে তসবী ঢিলা পায়জামা আর পা পর্যন্ত ঝোলানো পাঞ্জাবী গায়ে এসে দাঁড়ালো গেটের সম্মুখে।

নকীবকে দেখে বললো—বেটা, থোরা পানি দেগা?

ফিরে তাকলো নকীব—বৃদ্ধ ভিখারীর দিকে তাকিয়ে কয়েক পা এগিয়ে এলো বললো—পানি খাবে?

হাঁ, পানি পিয়েগা, বহুৎ পিয়াস হুয়ে।

আচ্ছা এখানে বসো, আমি পানি আনছি। নকীব চলে গেলো ভিতরে। একটু পরে পানি নিয়ে ফিরে এলো নকীব।

বৃদ্ধ পানি পান করে তৃপ্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

নকীব অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো বৃদ্ধ ভিখারীর চেহারা অতি পবিত্র অতি সৌম্য—সুন্দর। দেখলেই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা করে, ভক্তি করতে ইচ্ছা হয়।

নকীবকে লক্ষ্য করে বললো বৃদ্ধ ভিখারী—ব্যাটা, তুম্ মেরা পাশ কই চিজ মাংতা?

নকীব প্রথমে বুঝতে পেরে একটু আশ্চর্য হল, বলে সে—তুমি কি বলছো, আমি বুঝতে পারছিনা বাবাজী।

তুম্ মেরা বাত্ সমঝতা নেহি?

নেহি বাবা, নেহি আমি কিছু বুঝতে পারছিনা।

বৃদ্ধ হাসলো—তুম কই চিজ লেগা? তোমহারা কোই দুঃখ্ হ্যায়?

দুঃখ! হাঁ তা আছে বই কি? তুমি কি দেবে—টাকা না পয়সা?

নেহি হাম ভিখারী আদমি, তুমকো রূপেয়া হাম কাহাছে দেংগে বেটা। হাম্ তোমহারা দিল্‌কা খায়েস্ মিটানে চাহ্‌তা।

দিল্‌কা খায়েস। নকীব এবার একটু বুঝতে পারলো। একবার উর্দু ছবি দেখতে গিয়ে আপামণি তাকে দিল্‌কা খায়েস শব্দের মানে বুঝিয়ে বলেছিলো। মানেটা—মনের আশা।

এবার খুশী হলো নকীব, হেসে বললো—তুমি আমার মনের আশা মেটাতে পারবে?

হাঁ বেটা তুম জো চিজ চাহোগে হাম্ দেনে সাক্‌তা।

নকীব গালে হাত দিয়ে চিন্তা করতে লাগলো কি চিজ চাইবে সে। কোন্ অভাবটা এখন তার সব চাইতে বেশী। টাকা পয়সা—না; চৌধুরী

বাড়ীতে আজ সে পঁচিশ বছর ধরে আছে—টাকা পয়সার তো কোন অভাব হয়নি কোনদিন। যখন যা প্রয়োজন তাই দিয়েছেন মনিব-গৃহিনী। কি চাইবে, কই তার মনের আশা কিছু নেই তো। এ বাড়ীতে তার মনের সবসাধই পূরণ হয়েছে। বৌ—ছেলেমেয়ে—এসব তো অনেক দিন শেষ হয়ে গেছে।

বৃদ্ধ হেসে বললো—বেটা হাম্ জানতা তুম্হারা কোই খায়েস নেহি। একঠো দুঃখ হ্যায়, জো তুম্লোক কো হরওয়াক্ত বহুৎ পেরেশান রাখতা।

হাঁ, এবার মনে পড়েছে, আমার মনিবের বড় দুঃখ, বড় ব্যথা হয়েছে। আমাদের নূর হারিয়ে গেছে, কাজেই বাড়ীর সবাই এর জন্য দুঃখ অনুভব করছে।

বেটা, ঠিক বাত তুম্ বলা। নূর হাঁ নূর চোরী হুয়া হায়। বেটা, নূর মিল জায়েগা--

আনন্দে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠে নকীব—নূর মিল জায়েগা।

হাঁ বেটা হাম্ তসবী তেলায়েৎ করনেসে দেখ্যা—নূর মিল জায়েগা।

নকীব এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে ছুটলো সিড়ি বেয়ে উপরে।

মনিরা পদশব্দে নূরের জামাজুতো তাড়াতাড়ি সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালো, চোখ মুছে তাকাতেই নকীবকে দেখতে পেলো।

নকীব হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—আপামনি, নূরকে পাওয়া গেছে। নূরকে পাওয়া গেছে--

নূরকে পাওয়া গেছে। মনিরার চোখে মুখে খুশীর উচ্ছ্বাস ঝরে পড়লো—কোথায়? কোথায় সে?

নকীব বললো তখন— আপামনি, একটা ভিখারী এসেছে দরবেশ বলে মনে হলো, তিনি বললেন—নূরকে পাওয়া যাবে।

কোথায় সে দরবেশ নকীব?

নীচে—গেটের বাইরে।

তাকে বৈঠকখানায় নিয়ে এসো, আমি তার সঙ্গে দেখা করবো। যাও নকীব, যাও।

নকীব খুশী মনে চলে গেলো।

মনিরা তাড়াহুড়ো করে নেমে এলো নীচে। বৈঠকখানায় এসে দাঁড়াতেই নকীব এক দরবেশসহ কক্ষে প্রবেশ করলো।

মনিরা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। বৃদ্ধের চেহারার মধ্যে এক জ্যোতির্ময় ভাব ফুটে রয়েছে। বললো মনিরা —বসুন।

বৃদ্ধা মাথা নড়লো—নেহি বেটি হাম্ বৈঠেগা—নেহি। এক বাত বোলনে আয়া। তুম বহুতহি দুঃখী হ্যায়।

হাঁ বাবাজী, আমি বহুত দুঃখী। বাষ্পরুদ্ধ হলো মনিরার কণ্ঠ।

বৃদ্ধ বললো—হাম্ তসবী তেলায়েৎ সে দেখ্যা তোমহারা বেটা চোরী হুয়ে।

হাঁ, আমার নূর চুরি গেছে--

রোনা মাত বেটি। রোনা মাত। হাম্ ঐ কামছে আয়া বেটি। তোম্হারা নূর মিল জায়েগা--

নূরকে পাবো? ফিরে পাবো আমার নূরকে?

হাঁ বেটি, তুম্হারা নূর মিল জায়েগা। দরবেশ বাবাজী চোখ বন্ধ করে তস্‌বী তেলায়েৎ করতে শুরু করলো।

তস্‌বীটা কয়েক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ খুলে বললো—বেটি, তোমহারা নূর বহুৎ দুর হ্যায়।

তাহলে কি পাবোনা আমার নূরকে?

হাঁ মিল জায়েগা, আগার তোম্হারা শওহরকো লেকর তুম্ যা সেক্‌তি তব মিল জায়েগা।

কোথায় যাবো বলুন বাবাজী? আমি যাবো ওকে সঙ্গে করে।

হাঁ, তোম্হারা শাওহরকো ছোড় না যানা। আওর এক বাত শুনো বেটি।

বলো বাবাজী?

ও বাত তোম্হারা শাওহর কেন নেনি বেলা, তব নেহি মিলেগা তোম্হরা বেটা।

না না, আমি বলবো না বলবোনা ওকে। কিন্তু কোথায় যাবো?

বেটি হিয়াসে বহুৎ দূর নাহার মঞ্জিল নাম সে একঠো ঘর হায়, তোম্হারা শাওহর কো লেকর ঐ নাহার মঞ্জিল মে জায়োগি ওয়াহাঁ তোমহারা বেটা রহেগা। আভি হাম যা সেকতা?

আচ্ছা বাবাজী। মনিরা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

দরবেশ বাবাজী ধীর মন্থর গতিতে বেরিয়ে গেলো সেখান থেকে।

কথাটা মনিরা তার মামীমাকেও বললো না। একমাত্র নকীব ছাড়া আর কেউ জানলোনা।

মনিরা সব সময় ঐ এক চিন্তা নিয়েই সারাটা দিন কাটিয়ে দিলো। দরবেশ বাবাজীর কথাগুলো এখনও যেন তার কানে মধু বর্ষণ করছে। নাহার মঞ্জিল মে তোম্হারা নূর মিল জায়েগা--- নাহার মঞ্জিল—নাহার মঞ্জিল মনিরার চোখের সম্মুখে ভাসছে —অজানা অচেনা একটি বাড়ী। সেখানে নূর— তার হৃদয়ের ধন রয়েছে।

মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা নিয়ে ছটফট করতে লাগলো মনিরা কবে কখন আসবে তার স্বামী তাকে নিয়ে যাবে সে পুত্রের সন্ধানে। নাহার মঞ্জিল কোন চোর তার সন্তানকে চুরি করে রেখেছে। দরবেশ ঠিকই বলেছে খোদার ইবাদত করা লোক সব জানতে পারে ওরা। দরবেশ যদি সত্য জানতেই না পারে তাহলে তার স্বামীকে নিয়ে যাবার ইংগিত করবে কেনো? তিনি একথাও হয়তো জানতে পেরেছেন—তার স্বামী একজন শক্তিশালী পুরুষ।

❑

একদিন দু'দিন করে কয়েক দিন কেটে গেলো। মনিরার সারাটা রাত্রি কাটে অনিদ্রায়—প্রতি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করে সে স্বামীর।

সেদিন একটু তন্দ্রার মত হয়ে পড়েছে মনিরা—হঠাৎ পাশে কারো অস্তিত্ব অনুভব করে চমকে পাশ ফিরে, তাকালো, ভাগ্যিস চিৎকার করে মনিরা।

পাশ ফিরে তাকাতেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো মনিরার চোখ দুটো। খুশী ভরা কণ্ঠে বললো—তুমি!

বনহুর খাটে বসে পড়ে বললো—না, দস্যু বনহুর।

কি নেবে আমার?

তোমাকে!

হেসে উঠলো মনিরা খিল খিল করে।

বনহুর মনিরার চিবুক ধরে উচু করে বললো—আজ যে বড় খুশী খুশী লাগছে।

হাঁ, তোমাকে পাশে পেলে আমার সব দুঃখ, সব ব্যথা দূর হয়ে যায়।

সব ব্যথা ভুলে যেতে পারো? মিথ্যে কথা।

না, সত্যি করে বলছি?

ভুলতে পারো তোমার নূরকে?

হাঁ, তাই ভুলছি। তোমাকে পাশে পাবো বলে আমি নূরকে ভুলেছি।

বনহুর মনিরাকে টেনে নিলো কাছে।

স্বামীর বুকে মাথা রেখে বললো মনিরা—একটা কথা রাখবে আমার?

মনিরা, তুমি আমার সঙ্গে 'কুস্তিবাঈ' ছবি দেখতে চেয়েছিলে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারনি।

এবার রাখবে বলো?

যদি রাখবার মত হয় রাখবো। বলো?

না—রাখবার মত কিছু নয়। আচ্ছা বলোতো —কান্দাই শহরে নাহার মঞ্জিল কোথায়?

নাহার মঞ্জিল?

হাঁ, নাহার মঞ্জিল।

বনহুর একটু ভাবাপন্ন হয়ে পড়লো, বললো—নাহার মঞ্জিলের নাম তুমি কার কাছে শুনলে মনিরা?

শুনেছি, কিন্তু কোথায় জানিনা।

কান্দাই শহরের সবচেয়ে সেরা বাড়ী ছিলো এককালে এই নাহার মঞ্জিল। কিন্তু আজ সে বাড়ী পোড়াবাড়ী হয়ে গেছে।

নাহার মঞ্জিল পোড়াবাড়ী হয়ে গেলে এখন!

হাঁ, কিন্তু নাহার মঞ্জিলের পূর্বের সেই সৌন্দর্য এখনও যেন অক্ষত রয়েছে। বাড়ীটা দেখবার মত একটা জিনিষ। যাবে এ বাড়ী দেখতে?

সত্যি নিয়ে যাবে আমাকে সেই নাহার মঞ্জিলে?

এটা আর এমনকি, যাবো একদিন।

না একদিন নয়, আজ রাতেই নিয়ে চলো সেই নাহার মঞ্জিলে।

অবাক করলে মনিরা। এই গভীর রাতে--- তা হয় না।

তবে কথা দাও—কাল সন্ধ্যায় তুমি আসবে।

আসবো।

সত্যি বলছো?

হাঁ, সত্যি আসবো।

মনিরা ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো নূরের কথা মনে পড়লো তার। একটা কচি মুখ ভেসে উঠলো তার হৃদয়ের কোণে।

বনহুর মনিরার গালে মৃদু আঘাত করে বললো —কি ভাবছো আবার?

না, কিছু না।

বনহুর বললো—এসো মনিরা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

একটু হাসলো মনিরা, বললো—দস্যুর আবার ঘুম!

মনিরা! বনহুর ধরতে গেলো মনিরাকে।

মনিরা সরে দাঁড়ালো —উহুঁ।

বনহুর হাত বাড়ালো মনিরাকে ধরবার জন্য

মনিরা আবার সরে দাঁড়ালো।

মনিরা যতই দূরে সরে যেতে লাগলো বনহুর ওকে ধরবার জন্য ততই আগ্রহশীল হয়ে উঠলো।

বনহুরকে নাজেহাল পেরেশান। করাই যেন মনিরার উদ্দেশ্য। মনিরা কিছুতেই ধরা দিবেনা বনহুরকে।

এক সময় বনহুর মনিরাকে ধরতে গেলো।

অমনি মনিরা সুইচ টিপে আলো নিভিয়ে দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সরে গেলো সেখান থেকে।

বনহুর অন্ধকারে মনিরাকে হাতড়ে চললো।

মনিরা বিছানায় গিয়ে চুপ করে শুয়ে বালিশে মুখ চেপে হাসতে লাগলো।

বনহুর সুইচ টিপতেই মনিরা হেসে উঠলো খিল খিল করে।

বনহুরের মুখে খেলে গেলো দুষ্টুমির হাসি। কোন কথা না বলে আবার আলো নিভিয়ে দিলো বনহুর। এবার সে সোজা খাটে গিয়ে ধরে ফেললো মনিরাকে।

অন্ধকারে মনিরার চাপা আনন্দভরা কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো —এতো দুষ্টু তুমি!

❑

ভোরের আজান ধ্বনি ভেসে এলো অদূরস্থ কোন মসজিদ থেকে। ঘুম ভেংগে গেলো মনিরার। দরবড় করে উঠে বসে পাশে হাতড়ে দেখলো কেউ নেই—কোথায় তার স্বামী।

শয্যা ত্যাগ করে উঠে পাশের জানালাটা খুলে দিতেই এক ঝলক আলো ছড়িয়ে পড়লো কক্ষমধ্যে। মনিরা নির্বাক পুতুলের মত স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ শূন্য বিছানার দিকে তাকিয়ে রইলো। বুকের মধ্যে একটা ব্যথা হাহাকার করে উঠলো কি যেন ছিলো এই মুহূর্তে তা যেন নেই। একটা হাস্য—উজ্জ্বল বলিষ্ঠ মুখ ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে।

স্বামীর স্মৃতি চিন্তা করে অনাবিল এক আনন্দ উপভোগ করলো মনিরা হৃদয়ে। আজ আবার আসবে, দেখা হবে—মিলিত হবে তারা দু'জনে। মনিরার মনঃকষ্ট দূর হয়ে গেলো নিমিষে। শুধু স্বামী সঙ্গই সে লাভ করবেনা, ফিরে পাবে সে তার একমাত্র সন্তান, তার নুরকে। দরবেশ বাবাজীর কথাগুলো কানের কাছে ভেসে বেড়াচ্ছে—নাহার মঞ্জিল মে তোম্‌হারা বেটা মিল যায়েগা। নাহার মঞ্জিল--নাহার মঞ্জিলে যাবে আজ তারা।

হঠাৎ চমক্ ভাংগে মনিরার—এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেনো সে! আজ কি তার দাঁড়িয়ে থাকবার সময় আছে। এই তো দিনটা চলে যাবে কোন ফাঁকে সন্ধ্যায় আসবে ও নিয়ে যাবে তাকে।

কিন্তু রোজ এমন খালি মুখে ওকে ছেড়ে দেবে কি করে। স্ত্রী হয়ে স্বামীকে সে কোনদিন পাশে বসে খাওয়াতে পারলোনা এটা কি তার কম দুঃখ। ধীরে ধীরে আনমনা হয়ে যায় মনিরা, সকাল বেলা বিছানায় স্বামী ঘুমিয়ে থাকবে, পাশে বসে গায়ে মৃদু চাপ দিয়ে ডাকবে ওগো ওঠো --

—ও বলবে—উহুঁ আর একটু ঘুমাতে দাও।

—বলবে মনিরা —বেলা কত হলো দেখছো?—

—হতে দাও। বলে পাশ ফিরে শোবেও।—

—বলবে মনিরা —চা নাস্তা সব ঠান্ডা হয়ে গেলো যে।

—লক্ষীটি বিরক্ত করোনা---সেই ফাঁকে ও টেনে নেবে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে। স্বামীর বুকে মাথা রেখে বলবে সে—ছিঃ ছেড়ে দাও, কেউ দেখে ফেলবে যে---

—ফেলুক , ক্ষতি নেই—বলবে ও ---চমক ভাঙ্গে মনিরার কি—ভাবছে সে আবোল তাবোল, তাড়াতাড়ি বিছানাটা ঠিক করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকে। আজ তার হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দ—সন্ধ্যায় আসবে সে।

এখানে যখন মনিরা স্বামীর চিন্তায় মগ্ন, ওদিকে তখন বনহুর তার আস্তানার পথে ছুটে চলেছে। বনপথ মুখর হয়ে উঠেছে তাজের খুরের শব্দে। উল্‌কা বেগে ছুটে চলেছে তাজ।

আস্তানায় পৌছতেই দু'জন অনুচর এসে তাজের পাশে দাঁড়ালো।

বনহুর লাফ দিয়ে নেমে পড়তেই অনুচরদ্বয় তাজের লাগাম টেনে ধরলো।

বনহুর যখন তাজের পিঠের দূর হতে আগমন করতো তখন তাজ এক নতুন উদ্যমে পথ চলতো। বনহুর নেমে পড়লেও তাজের চলার যে উন্মাদনা মিটতোনা যেন। চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়লেও সম্মুখের পা দিয়ে মাটিতে ক্রমাগত আঘাত করতো।

যতক্ষণ না তাজকে ধরতো ততক্ষণ তাজ অস্থিরভাবে এই রকম মাটিতে আঘাত করতো।

বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে আস্তানায় প্রবেশ করলো।

অনুচরদ্বয় তাজকে নিয়ে টহল দিতে দিতে চলে গেলো তাজের বিশ্রাম কক্ষে।

বনহুর আস্তানায় প্রবেশ করতেই তার পাহারারত অনুচরগণ কুর্ণিশ জানিয়ে সরে দাঁড়াতে লাগলো।

গহন বনের মধ্যে একটা বিরাট পাথর স্তূপের আড়ালে বনহুরের আস্তানায় প্রবেশের মুখ।

বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই—ঐ পাথর স্তূপের ওপাশে কি আছে।

পাথরটার গায়ে চাপ দেবার একটা যন্ত্র আছে—সেটাতে চাপ দিলেই ধীরে ধীরে পাথরটা সরে যায় এক পাশে। বেরিয়ে পড়ে একটা সুড়ঙ্গ মুখ, এটাই বনহুরের আস্তনার প্রবেশপথ।

বনহুর এগুতেই নুরী ছুটে এলো—খুশীতে উচ্ছল তার চোখমুখ। বনহুরের দক্ষিণ হাতখানা চেপে ধরে বললে—কোথায় ছিলে আজ রাতে। কত কাজ আমার, ঠিক্ আছে বলো?

কাল রাতে সবাই তো আস্তানায় ছিলো, শুধু ছিলেনা তুমি।

বনহুর এগিয়ে চললো।

নূরী পিছন পিছন চলতে চলতে বললো—আমার কথার জবাব দিচ্ছোনা কেনো হুর?

চলতে চলতে বললো বনহুর—বললাম তো কাজ ছিলো!

রহমানকেও তো কিছু বলে যাওনি হুর?

না, আমার বিশেষ কোন কাজ ছিলো।

কথা বলতে বলতে বনহুর আর নূরী বনহুরের বিশ্রাম কক্ষে এসে পৌঁছলো।

বনহুর ড্রেস খুলতে খুলতে বললো—এখনও কৈফিয়ৎ নূরী? একটু থেমে বললো আবার—তোমার মনিকে নিয়ে এখনতো বেশ আছো? তবুও আমাকে.

হাঁ, তবুও তোমাকে আমি কোথায়ও যেতে দেবো না হুর।

এখনও তুমি পূর্বের ন্যায় ছেলেমানুষী করবে?

ছেলেমানুষী নয় হুর, আমি চাইনা তুমি. আমাকে না বলে কোথাও যাও। বলো আর যাবেনা কোথাও? নূরী বনহুরের জামার আস্তিন চেপে ধরে।

হেসে বলে বনহুর—আচ্ছা তাই হবে।

সত্যি কথা দিচ্ছো তো?

বনহুর নূরীর গালে আংগুল দিয়ে মৃদু আঘাত করে বলে— হাঁ সত্যি।

বনহুরের জামার বোতাম খুলে দিতে দিতে হাসে নূরী।

বনহুর বলে—তোমার মনি কোথায়?

নূরী বলে—ঘুমাচ্ছে।

আর তুমি এত ভোরে জেগে উঠেছো, তোমার মনিকে ছেড়েই?

এমন সময় নূরীর সহচরী জেরিনা এসে দাঁড়ায়! বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে বলে সে—সর্দার, নূরী গোটা রাত ঘুমায়নি।

বনহুর অবাক হয়ে তাকালো নূরীর মুখের দিকে, তারপর ফিরে চাইলো জোরিনার মুখে, বললো—কেনো?

জোরিনা কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ধমক দিলো নূরী—তুই চলে যা জোরিনা, এখান থেকে।

জেরিনা একবার সর্দার ও নূরীর মুখে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেলো।

জেরিনা বেরিয়ে যেতেই বললো বনহুর—নূরী, আমি আজ জানতে চাই, তুমি কেনো ঘুমাওনি।

মাথা নত করলো নূরী।

বনহুর বাম হস্তে নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে তুলে বললো—সব বুঝতে পেরেছি। কিন্তু নূরী, তোমাকে তো মনিকে এনে দিয়েছি তবু কেনো তুমি-----গম্ভীর হয়ে পড়লো বনহুর।

নূরী বললো—মনিকে দিয়ে তুমি কি সরে পড়তে চাও? হাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি, যেদিন থেকে তুমি আমার কোলে মনিকে এনে দিয়েছো তারপর থেকে সব সময় আমাকে তুমি এড়িয়ে চলো।

বনহুর হঠাৎ যেন বিপদে পড়ে গেলো, যতই সে নূরী থেকে দূরে থাকতে চায়, ততই নূরী যেন তাকে অক্টোপাসের মত আকড়ে ধরতে যায়। কিন্তু—শুধু কি নূরীই তাকে ভালবাসে, না এর পিছনে তার মনেরও প্রবল আকর্ষণ আছে। বনহুর শয্যায় এসে বসে পড়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। নূরীই শুধু তাকে আকর্ষণ করে না, তারও অপরাধ আছে।

বনহুর নূরীর কাছে নিজকে দুর্বল মনে করে, বলে সে—নূরী, তোমাকে না বলে আমি কোথাও যাবোনা।

নূরী খুশী হয়, বনহুরের পাশে বসে ওর চুলে আংগুল বুলিয়ে দেয়।

নূরীর কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

নূরী অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখের দিকে।

ভোরের সূর্য তখন পূর্ব আকাশে অনেক উপরে উঠে গেছে।

❑

অর্দ্ধদগ্ধ সিগারেটটা এ্যাসট্রেতে নিক্ষেপ করে আর একটি সিগারেট অগ্নি সংযোগ করে বললেন আহম্মদ সাহেব—নাহার মঞ্জিল। দস্যু বনহুরকে বন্দী করবার বিরাট একটা ফাঁদ এখানে পাতা হয়েছে। শত শত সশস্ত্র

পুলিশ ফোর্স এই নাহার মঞ্জিলের গোপন স্থানে লুকিয়ে রয়েছে। এবার যত বুদ্ধিমানই সে হোক, কিছুতেই এ ফাঁদ থেকে উদ্ধার পাবে না।

মিঃ জাফরীর চোখমুখে ক্রুদ্ধভাব ঝরে পড়ছে, তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এবার বনহুর কিছুতেই পুলিশ বাহিনীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না। মিঃ আহম্মদ, সত্যি আপনার দক্ষ বুদ্ধি কৌশলের কাছে আমিও হেরে গেলাম।

মিঃ আহম্মদ সিগারেট থেকে এক মুখ ধোয়া সম্মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন—আজ চার দিন যাবত নাহার মঞ্জিল আমার পুলিশ বাহিনী দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য বিপুল আগ্রহ নিয়ে প্রতিক্ষা করছে। আমি চব্বিশ দিন যাবত ঐ নাহার মঞ্জিলে নানা কৌশলে পুলিশ বাহিনী লুকিয়ে রাখবার গোপন স্থান আবিস্কার করেছি।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ আহম্মদ। বললেন মিঃ জাফরী।

মিঃ আহম্মদ বললেন—এবার অতি গোপনে এ কাজ আমি করেছি, এমন কি দুদিন পূর্বেও আপনিও জানতেন না, আমি কোথায় কি করেছি।

এবার নিশ্চয়ই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

হাঁ মিঃ জাফরী, দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার না করে এবার আমি বিশ্রাম গ্রহণ করবো না। চলুন, আজ নাহার মঞ্জিলটা একবার স্বচক্ষে দেখে আসবেন। দেখুন, অতি গোপনে ওখানে যেতে হবে। আপনি আর আমি ছাড়া কেউ জানেনা, আর জানে আমার কিছুসংখ্যক পুলিশ ফোর্স। দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলে এদের আমি পুরস্কৃত করবো। শুধু পুরস্কৃতই নয়, উপাধিও লাভ করবে তারা।

আরও কিছুক্ষণ মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরীর মধ্যে গোপন আলোচনা চলার পর মিঃ আহম্মদ বললেন—এবার চলুন, নাহার মঞ্জিলটা দেখে আসবেন।

অতি গোপনে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ আহম্মদ এবং মিঃ জাফরী।

❑

কান্দাই শহরের শেষ প্রান্তে দক্ষিণ—পশ্চিম কোণে নাহার মঞ্জিল অবস্থিত। সেকালের কোন সৌখিন নবাবজাদা সখ করে নির্জন স্থানে এই মঞ্জিলটা তৈরী করেছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিলো এই মঞ্জিল গড়ে

তুলতে। প্রায় এক মাইল নিয়ে এ বাড়ীটা। অসংখ্য কুঠরী আর কক্ষে ঘেরা একটি রঙমহল। রঙমহলের সে জৌলুস যদিও আজ আর নেই তবু মানবচক্ষু স্থির হয়ে যায় রঙমহলের কারুকার্য খচিত দেয়াল, দৃঢ় প্রাচীর আর গেটের দিকে তাকিয়ে।

বিরাট বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষে আর বট বৃক্ষে ছেয়ে গেছে আজ সেকালের নাহার মঞ্জিল। কোথাও বা ছাদ ধসে পড়েছে, কোথাও বা দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে। কোথাও ঠিক পূর্বের ন্যায় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে দেয়ালগুলো।

এ বাড়ীটার মধ্যে কেউ প্রবেশ করলেই বাইরে বেরিয়ে আসা অত্যন্ত কঠিন। কোথায় পথ বা দরজা বোঝা যায় না।

নাহার মঞ্জিলের অর্দ্ধেকটা আজ মাটির নীচে চলে গেছে। তবু যতটুকু জেগে রয়েছে মাটির বুকে, তাই মনে হয় যেন একটা পাহাড়। নাহার মঞ্জিল একটা দেখবার মত জিনিষ ছিলো এক কালে।

আজ সেই নাহার মঞ্জিল একটা ভূতুড়ে বাড়ী বা পোড়া-বাড়ীতে পরিণত হয়েছে। ভুলেও কোন পথিক এ পথে পা বাড়ায় না। যদিও এখনও এখানে দেখবার মত অনেক কিছুই বিদ্যমান রয়েছে, তবু একটা অজানা ভয় সদা-সর্বদা বিরাজ করছে এই বাড়ীতে প্রবেশ করলে আর বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে না। সেই কারণেই জনগণ এই মঞ্জিলটার নাম শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠে। ভুলেও কোনদিন এ বাড়ী দেখবার জন্য ওদিকে যায় না, বা সখ করে না।

নাহার মঞ্জিলের বিরাট এক কাহিনী আছে। যে কাহিনী এখন কান্দাই এর লোকের কাছে রূপকথার মতই মনে হয়। নবাব জামরুদী ছিলেন সেকালের একজন রাজা-মহারাজার মত প্রতাপশালী জমিদার। কান্দাই শহরের বুকে ছিলো তার প্রবল আধিপত্য। যেমন রাগী তেমনী খেয়ালী মানুষ ছিলেন তিনি। জীবনে কোন নারীকে জামরুদী বিয়ে করেননি। কিন্তু তার বিশ্রামাগারে নারীর কোন অভাব ছিলোনা। জামরুদী সপ্তাহে এক দিন নগর ভ্রমণে বের হতেন। সঙ্গে থাকতো দুইজন সহচর আর অসংখ্য দেহরক্ষী। শহরের যে কোন মেয়ে তার নজরে পড়তো, তাকে তার চাই।

জামরুদীর ইংগিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহরক্ষীর দল সেই অসহায়া নারীকে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যেতো। এমনি ছিলো জামরুদীর খেয়াল।

জামরুদীর অত্যাচারে নগরবাসী সদা আতঙ্কে কাল কাটাতো। কিন্তু রক্ষক যদি ভক্ষক হয় তাতে কে কি বলতে পারে! কাজেই সবাই নীরবে অশ্রু ফেলতো কিন্তু মুখে কোন কথা বলতে পারতোনা।

দেশের নারীগণের এই চরম অবস্থা লক্ষ্য করে এক সাধক কন্যা—নাম তার নাহার, শপথ গ্রহণ করলো—যেমন করে হোক জামরুদীর কবল থেকে এই নারীকুলকে রক্ষা করবে সে।

নাহার ছিলো সাধক সুলতান আলীর কন্যা। অপূর্ব রূপসী ছিলো সে। নাহারকে জীবনে কোন পুরুষ দেখে নাই বা তার সঙ্গে কথা বলেনি! নাহারের কণ্ঠস্বর ছিলো মধুর। চোখ দু'টি ছিলো অদ্ভুত মায়াময়।

এই নাহারের প্রাণ কেঁদে উঠলো শত শত মা-বোনদের জন্য। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো—কেমন করে রক্ষা করা যায় এই অবলা নারীগণকে। আজ পর্যন্ত কত শত নারীর জীবন বিনষ্ট হয়েছে—আরও হবে,. তার ইয়ত্তা নেই।

নাহার একদিন সাধক সুলতান আলীর কাছে মনের কথা ব্যক্ত করলো বাবা, কি করে দেশের নারীগণকে শয়তান নবাব জামরুদীর কবল থেকে রক্ষা করা যায়?

কন্যার কথায় সুলতান আলীর যেন ধ্যান ভঙ্গ হলো। তাই তো! তিনি দিবারাত্রে খোদার ইবাদত নিয়ে মশগুল থাকেন কিন্তু দেশের নবাব দিনের পর দিন কি অন্যায় অবিচার করে যাচ্ছেন সেদিকে খেয়াল করেন না। কন্যার কথায় তার চক্ষু খুলে যায়। তিনি বলেন—মা, তুমি ঠিক্ বলেছো। হাঁ, এ চিন্তা এখনও আমি করিনি। সত্যি আমি ভুল করেছি মা। কিন্তু কি উপায় আছে জামরুদীর কবল থেকে দেশের নারীগণকে রক্ষা করার?

বাবা, কোন কি উপায় নেই?

না মা বড় পিশাচ্ এই নবাব। কোন বাধাই তাকে দমন করতে পারবে বলে মনে হয় না। রক্ষক হয়ে যদি সে ভক্ষক হয়, কি করা যায় বল?

বাবা, আমি ওকে দমন করবো। দীপ্ত কণ্ঠে বলে নাহার।

সঙ্গে সঙ্গে সাধক বাবাজীর মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়, বললেন—মা, এ তুই কি বলছিস? আজ আঠারো বছর ধরে তোকে আমি লুকিয়ে রেখেছি? শুধু তোরই জন্য আমি আজ সন্ন্যাসী হয়ে বনে বনে লুকিয়ে রয়েছি। শুধু তোরই জন্য.....ঐ ঐ লম্পট জামরুদীর জন্য......

বাবা!

হাঁ মা, আজ আমি সন্ন্যাসী হয়েছি শুধু তোর কারণে। জানতাম, দেশে থাকলে তোকে আমি জামরুদীর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবোনা।

বাবা, বাবা তুমি আমার জন্য.....

হাঁ, নাহার শুধু তোর জন্য আজ আমি দেশত্যাগী সন্ন্যাসী। বন আজ আমার আশ্রয় স্থান। বনের ফল আমার খাদ্য। মাটি আমার বিছানা.....সব,

সব তোর জন্যই আমি বেছে নিয়েছি। নাহার, তোর মাকেও ঐ জামরুদী ধরে নিয়ে গিয়েছিলো, তুই তখন দুই বছরের শিশু।

বাবা!

মা, আমি তখন জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলাম, স্ত্রী গেলো তাও সহ্য করলাম কিন্তু ভবিষ্যতের একটা ভয়ঙ্কর রূপ ভেসে বেড়াতে লাগলো আমার চোখের সম্মুখে। তোর ভবিষ্যত ভেবে আমি তোকে বুকে করে পালিয়ে গেলাম রাতের অন্ধকারে। কিন্তু হাঁ তোর মাকে জামরুদী ধরে নিয়ে গিয়েছিলো সত্য, কিন্তু তাকে জামরুদী পায়নি। ঘোড়ার পিঠ থেকে নদীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো, আর সে ভেসে উঠেনি।

বাবা, এ কথা তুমি কেমন করে জানলে? আমার মা জামরুদীর কবল থেকে রক্ষা পেয়েছিলো?

আমার এক পরম আত্নীয় পিছু নিয়েছিলো—উদ্দেশ্য ছিলো তোর মাকে রক্ষা করতে পারে কি না। সেও আর একটি ঘোড়ার পিছু নিয়েছিলো, কিন্তু তোর মা নদীবক্ষে নিমজ্জিত হবার পর সে আর এগোয় নি। গাছের আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করছিলো—ফিরে এসে সে শপথ করে বলেছিলো তোর মায়ের এই শেষ পরিণতির কথা। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো সাধক বাবাজীর কণ্ঠ। চোখ মুছে আবার বললেন—এক সপ্তাহ পর একটা লাশ পাওয়া গিয়েছিলো নদীবক্ষে। ভীড় ঠেলে আমিও গিয়েছিলাম সেদিন ঐ লাশটা দেখতে, তোকে কোলে করে। হাঁ, আর কেউ না চিনতে পারলেও আমি চিনতে পেরেছিলাম তাকে। এক সঙ্গে বিশ বছর ধরে ঘর করেছিলাম আর তাকে চিনবোনা। যদিও তোর মার দেহ পঁচে গলে যাবার মত হয়েছিলো—তবু চিনেছিলাম।

কথা বলতে বলতে আনমনা হয়ে যায় সাধক বাবাজী। সুপক্ক কেশ গুল্‌ফে ঢাকা মুখখানা অসম্ভব বিষাদময় হয়ে উঠেছিলো সেদিন তার।

কিন্তু নাহারের চোখ দুটো কেমন যেন উজ্জ্বল মনে হয়েছিলো, অস্ফুট কণ্ঠে বলেছিলো নাহার—বাবা, আমি এই জামরুদীকে সায়েস্তা করবো।

শিউরে উঠে বলেছিলো সাধক বাবাজী—সে পাপাচারের সম্মুখ থেকে তোকে সরিয়ে রেখেছি অতি কষ্টে, অতি সাবধানে—আর তুই তাকে শায়েস্তা করবি—বলিস কি মা!

দীপ্ত কণ্ঠে বলেছিলো নাহার—হাঁ, আমি ওকে সায়েস্তা করবো। বাবা, তুমি আমাকে অনুমতি দাও।

সাধক বাবাজী শেষ পর্যন্ত কন্যা নাহারকে অনুমতি না দিয়ে পারেননি।

আশ্চর্য এই নাহার। নারী হয়ে নারীর অবমাননা সে কিছুতেই সহ্য করতে পারলোনা। পিতার অনুমতি নিয়ে একদিন নাহার জামরুদীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। সেদিন সে অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিত হয়েছিলো।

নাহার ছিলো অদ্ভুত সুন্দরী। তারপর এই মনোহারী পোষাক পরিচ্ছদে তাকে খুবই সুন্দর লাগছিলো। স্বর্গের অস্পরীর চেয়ে কোন অংশে কম ছিলোনা সে।

জামরুদী নাহারের রূপে তন্ময় হয়ে গেলো। নিজের চোখ দুটিকে সে বিশ্বাস করতে পারলোনা, তার সম্মুখে দন্ডায়মান নারীমূর্তি মানবী, না দেবী বুঝতে পারলোনা সে।

জামরুদী তখন তার বাগান-বাড়ীতে পায়চারী করছিলো।

সেই সময় নাহার গোপনে বাগানে প্রবেশ করে জামরুদীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

বিস্ময় বিস্ফায়িত নয়নে জামরুদী দেখলো নাহারকে।

নাহারের ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা। চোখে ইংগিতপূর্ণ ভাবময়ী চাহনী। জামরুদীর হৃদপিন্ড বিদ্ধ করলো সে দৃষ্টি-শক্তি।

জামরুদী যেন সম্বিত হারিয়ে ফেললো, বললো—কে তুমি?

নাহার এসেছে নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে শত শত নারীর ইজ্জত রক্ষার্থে। সেও ভুলে গেলো গোটা পৃথিবীটাকে, নাহারের চোখের সম্মুখে ভাসছে অগণিত মা-বোনদের করুণ মুখচ্ছবি। তাদের হৃদয়বিদারক মর্মস্পর্শী আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছে সে কানে। নাহার বললে—আমি তোমার প্রেয়সী নাহার।

নাহারের সুমধুর কন্ঠস্বরে মোহগ্রস্তের মত জামরুদী অস্ফূট ধ্বনি করে উঠলে—তুমি আমার প্রেয়সী?

হাঁ.....বললো নাহার!

জামরুদী জ্ঞানশূন্যের মত দুই হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলো নাহারকে। চোখেমুখে তার কুৎসিৎ লালসাপূর্ণ ভাব!

জামরুদী ধরতে গেলে কয়েক পা পিছিয়ে গেলো নাহার। বললো সে—না না, তুমি আমাকে ধরোনা। শোন।

জামরুদী থমকে দাঁড়ালো, মুহূর্ত বিলম্ব যেন তার সইছেনা। নাহারকে কাছে পাবার জন্য উম্মাদ হয়ে উঠলো সে।

বললো নাহার—আমার তিনটি বাসনা পূর্ণ করলে তবেই তুমি আমাকে পাবে।

বলো, কি তোমার বাসনা? বললো জামরুদী।

নাহার বললো—প্রথম হলো—সাতক্ষীরা পাহাড়ের ধারে মস্ত বড় একটি বাড়ী তৈরী করতে হবে—নাম নাহার মঞ্জিল। দ্বিতীয়—তুমি কোন নারী দেহকে স্পর্শ করতে পারবেনা। তৃতীয় হলো—তুমি আমায় বিয়ে করবে।

জামরুদী তখন নাহারের রূপে এতো তন্ময় হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়া তার কাছে সামান্য তুচ্ছ বলে মনে হচ্ছে। নাহারই এখন যেন তার কাছে সব। সব ছাড়তে সে বাধ্য হবে যদি নাহারকে পায়।

জামরুদী শেষ পর্যন্ত নাহারের বাসনা পূর্ণ করেছিলো! কান্দাই শহরের অনতিদূরে সাতক্ষীরা পাহাড়ের পাদমূলে গড়ে দিয়েছিলো সে 'নাহার মঞ্জিল'। আর কোন দিন জামরুদী ভুল করেও কোন নারীদেহ স্পর্শ করেনি। নাহারের জন্য লম্পট জামরুদী সাধু বনে গিয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত নাহার জামরুদীকে বিয়ে করেছিলো কিন্তু জামরুদীর বাসরকক্ষে সে প্রবেশ করেনি—আত্মহত্যা করে সে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছিলো।

জামরুদীকে ফাঁকি দিয়ে নাহার পরপারে চলে গেলেও জামরুদী আর কোনদিন ভুলতে পারেনি নাহারকে। নাহারও এটা বুঝতে পেরেছিলো—জামরুদী তাকে এতো ভালবেসে ফেলেছে যার জন্য সে তার সব ঐশ্বর্য নিঃশেষ করে তৈরী করেছিলো নাহার মঞ্জিল। সব সে ত্যাগ করেছে নাহারের জন্য। নাহার জানতো, যে তাঁর জন্য সব ত্যাগ করতে পারলো, এমন কি সমস্ত ঐশ্বর্য যে নিঃশেষ করেছিলো সে কোনদিন তাকে ভুলতে পারে না। নিশ্চয়ই জামরুদী তার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়বে, তখন সে সাধু বা সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। লম্পট হতে আর পারবে না, পারবে না সে আর কোন কুকর্ম করতে। কারণ, নাহারকে পাবার জন্য জামরুদী তার যথাসর্বস্ব দিয়ে গিয়েছিলো নাহার মঞ্জিল।

নাহার যখন জামরুদীকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেলো তখন জামরুদী নিঃসম্বল—পথের ভিখারীর চেয়েও অসহায়। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, এমন কি দাসদাসী কেউ ছিলোনা তখন তার সম্বল একমাত্র নাহার মঞ্জিল জামরুদীর আশ্রয় স্থান।

জামরুদী নাহার মঞ্জিলে কবর দিলো নাহারকে।

তারপর বহুদিন জামরুদীকে কেউ দেখেনি। হঠাৎ একদিন ভোরে লোকজন দেখলো—নাহারের কবরের পাশে পড়ে আছে এক জটাজুটধারী পাগলের মৃত দেহ।

সবাই দেখলো, এ মৃতদেহ অন্য কারো নয়—নবাব জামরুদী।

একদিন যে জামরুদীর প্রচন্ড দাপটে নগরবাসী থরথর করে কাঁপতো, কান্দাই এর নারীগণ যে জামরুদীর কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য আতঙ্কগ্রস্ত থাকতো, সেই জামরুদীর শেষ পরিণতি দেখে অনেকেরই চোখে অশ্রু এসেছিলো।

জামরুদীর হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু রক্ত দিয়ে গড়া নাহার মঞ্জিল আর ভুতুড়ে বাড়ী। ভুলেও কোন মানুষ সেদিকে পা বাড়ায়না। কান্দাই এর লোক নাহার মঞ্জিলের নামে শিউরে উঠে।

আজ সেই নাহার মঞ্জিল দস্যু বনহুরকে বন্দী করবার ফাঁদ হিসাবে কাজে লাগাচ্ছেন মিঃ আহম্মদ।

নাহার মঞ্জিলের প্রতিটি গোপনকক্ষে লুকিয়ে আছে শত শত পুলিশ ফোর্স। রাইফেল, পিস্তল, বন্দুক, নানা রকম অস্ত্রে সজ্জিত পুলিশ বাহিনী।

মিঃ আহম্মদ মিঃ জাফরীকে সব দেখালেন।

মিঃ জাফরী অবাক হয়ে দেখলেন—নাহার মঞ্জিলের অভ্যন্তরে কি দুর্গম, কি ভয়ঙ্কর ভাবে ফাঁদ পেতেছেন মিঃ আহম্মদ। মিঃ জাফরী তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ না জানিয়ে পারলেন না।

মিঃ আহম্মদ বললেন—বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবে না, এই নাহার মঞ্জিলে কোন প্রাণী আছে।

হাঁ, আপনার কথা ঠিক। বাইরে থেকে সম্পূর্ণ একটি পোড়া বাড়ী বলে মনে হচ্ছে। কোন জনমানব এদিকে পা দিয়েছে বলে মনে হয় না। অদ্ভুত আপনার বুদ্ধি-কৌশল মিঃ আহম্মদ। কিন্তু সুচতুর দস্যু কোন রকমে না টের পেয়ে থাকে।

না, সে কিছুতেই টের পাবে না। এবার আমি তাকে ফাঁদে ফেলবোই। মিঃ জাফরী, আজ রাতে দস্যু বনহুর এ বাড়ীতে আসবেই।

তাহলে....

তাহলে আজ আমাদেরও এখানে, এই নাহার মঞ্জিলে থাকতে হবে। মিঃ জাফরী, আপনি রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে এসেছেন নিশ্চয়ই?

হাঁ, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী এবার নাহার মঞ্জিলের একটি চোরা কক্ষে আশ্রয় নিলেন।

যে কক্ষে মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী লুকিয়ে রইলেন সেই কক্ষের পাশেই মস্ত বড় হলঘর। এই হলঘরের মেঝেতেই রয়েছে নাহারের কবর।

যে নারী একদিন শত শত নারীকে উদ্ধারের জন্য নিজের জীবন বিনষ্ট করেছিলো, নিজকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো মৃত্যুর কোলো—সেই নাহারের কবরের অদূরে লুকিয়ে রইলেন দু'জন পুলিশ ইন্সপেক্টার। উভয়েরই হস্তে গুলীভরা রিভলবার।

মিঃ আহম্মদের বাম প্যান্টের পকেটে রয়েছে হুইসেল। এই হুইসেলের এক ফুৎকারে সমস্ত পুলিশ বাহিনী চারদিক থেকে বেরিয়ে আসবে, ঘেরাও করে ফেলবে নাহারের কবরস্থান।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। নাহার মঞ্জিলের চারিপাশে ঘনীভূত হয়ে আসছে রাতের অন্ধকারে।

❑

বিপুল আকাঙ্খা নিয়ে মনিরা প্রতীক্ষা করছে স্বামীর। মনিরার হৃদয়ে আজ এক অদ্ভুত অনুভূতি। একটা কেমন যেন উম্মাদনা তার সমস্ত অন্তরটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। গোটা দিনটাই আজ মনিরার কেটেছে অস্থিরতার মধ্যে।

মরিয়ম বেগম মনিরার এ চঞ্চলতা লক্ষ্য করেছিলেন, তিনি এক বার বলেও ছিলেন—মনিরা, আজ ঐ দুষ্টটা আসবে বুঝি?

মৃদু হেসে বলেছিলো মনিরা—হয়তো আসতে পারে।

মামীমাকে আর কিছু বলবার সময় না দিয়ে নিজের ঘরে চলে গিয়েছিলো মনিরা, পাছে আর কোন প্রশ্ন করে বসেন তিনি।

নাহার মঞ্জিলের কথা কাউকে বলতে মানা করেছেন সাধক বাবাজী। স্বামীকে না বললে নয়, তাই বলেছে মাত্র সে। তবু মনিরা সে কথা বলে নি, বলতে নিষেধ আছে সেকথা।

কিন্তু দিনটা হেন কাটতে চাইছে না। রোজ কোথা দিয়ে কোথায় সময় কেটে যায়, আর আজ সন্ধ্যা হবে কখন।

মনিরা আজ অনেক কিছু নিজ হস্তে রান্না করেছে।

মরিয়ম বেগম লুকিয়ে লুকিয়ে সব লক্ষ্য করলেও সামনে আসেননি। স্বামীর কথায় কে না লজ্জা পায়। তবু তো এখানে থাকে না; আসে বহুদিন পর—লজ্জা কাটবে কি করে।

মনিরাকে এ সব করবার সুযোগ দিয়ে সরে থাকেন মরিয়ম বেগম।

অফুরন্ত আনন্দ আর খুশীখুশী ভাব নিয়ে মনিরা এ সব তৈরী করলো আজ।

নানা রকমের খাবার নিজের ঘরে টেবিলে সাজিয়ে রেখে, নিজে খুব করে সেজে নিলো—শুধু স্বামীই আসবে না, আজ ফিরে পাবে সে তার নূরকে।

মনিরা অফুরন্ত উম্মাদনা নিয়ে ঘরবার করছে। কখনও রেলিং এর ধরে, কখনও মুক্ত জানালায়, কখনও বা বাগানের পাশে গিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো সে। না জানি কখন কোন মুহূর্তে আসবে তার আকাঙ্খার জন।

আজ নিজের হাতে মনিরা ঘর সাজিয়েছে।

বনহুরের ছোটবেলার ফটোখানার নতুন মালা পরিয়ে বার বার দেখছে। কেনো যে ঐ ছোট্ট মুখখানা আজ মনিরাকে বার বার আকর্ষণ করছে।

স্বামীর ছোট বেলার ছবির পাশেই নিজের ছোট মুখখানা বড় মিষ্টি লাগছে আজ। পাশাপাশি দুটি মুখ্ যে মুখ দুটি কোনদিন পৃথক হবার নয়।

নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা ছবিটার দিকে।

মরিয়ম বেগম হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ালেন; হেসে বললেন—মনিরা!

চমকে ফিরে তাকালো মনিরা—মামীমা আমায় ডাকছো?

হাঁ, আমি একটু খালেদাদের বাড়ী যাচ্ছি, কিছু পরেই ফিরে আসবো। সরকার সাহেব আমার সঙ্গে যাবেন।

মনিরা বুঝতে পারলো, তাকে সুযোগ দিয়ে সরে পড়তে চান মামীমা। কারণ, ও এলে অসুবিধা বোধ করতে পারে। মায়ের উপস্থিতিতে তারা অবাধে মিশতে পারবেনা ভেবেই তিনি বোন খালেদার বাড়ী বেড়াতে যাচ্ছেন।

মনিরা একটু হেসে বললেন—দেরী করোনা যেন।

না দেরী করবো—যাবো আর আসবো। মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বেরিয়ে যান মরিয়ম বেগম।

মনিরা যা ভেবেছিলেন তাই—সত্যি মরিয়ম বেগম বুঝতে পেরেছিলেন, আজ সকাল সকাল মনিরা আসবে। হয়তো কোন অন্যরূপ নিয়েই সে আসবে। কাজেই মায়ের সামনে অতোটা কিছু পারবে না, হয়তো নিজকে প্রকাশ করতে লজ্জা বোধ করবে।

কোনদিন সন্ধ্যা রাতে সে আসেনি। কোনদিন মনিরা স্বামীকে পায়নি এসময়ে কাছে। আহা বেচারী মনিরা—ওর কি সখ হয়না স্বামীকে খাওয়াবার বা পাশে বসে দুটো ভালমন্দ কথাবার্তা বলবার।

মরিয়ম বেগম সরকার সাহেবকে বললেন—ড্রাইভারকে বলুন গাড়ী বের করতে, খালেদাদের বাড়ী যাবো।

সরকার সাহেব হঠাৎ মরিয়ম বেগমের মুখে বেড়াতে যাবার কথা শুনে আজ অবাক না হয়ে পারলেন না। কারণ তিনি কোনদিন দেখেন নাই নিজ মনে বেগম সাহেবা কোথাও বেড়াতে যেতে চেয়েছেন।

সরকার সাহেব বিস্মিত হলেও মুখে কোন কথা বললেন না। তিনি চলে গেলেন ড্রাইভারকে গাড়ী বের করার আদেশ দিতে।

মরিয়ম বেগম চলে গেলেন খালেদার বাড়ী বেড়াতে।

ঠিক্ তার পরমুহূর্তেই কক্ষে প্রবেশ করলো নকীব।

মনিরা বললো—কি খবর নকীব?

আপামনি, কে একজন রাজকুমার আপনার সাক্ষাৎ চায়।

রাজকুমার!

হাঁ খুব সুন্দর দেখতে, গায়ে রাজার মত চক্‌চকে কাপড়। আমি বললাম, বাড়ীতে কেউ নেই—আম্মাও নেই, সরকার সাহেবও নেই। তবু বললেন রাজকুমার—তোমার আপামনিও নেই?

আপামনি! আমার কথা জানলো সে কি করে? তুই বুঝি বলেছিস?

না, আমি কোন কথাই বলিনি, সত্যি করে বলছি।

কিন্তু আমি কি করে যাবো? যা গিয়ে বল্ আজ দেখা হবেনা।

নকীব চলে গেলো, কিন্তু একটু পরে ফিরে এসে বললো নকীব—আপমনি, রাকজুমার এই চিঠিটা দিলো, বললো তোমাকে দিতে।

অসময়ে এ ধরনের বিরক্তি ভালো লাগলো না মনিরার। কে এই রাজকুমার—এতো বড় সাহস, তার সঙ্গে দেখা করতে চায়। নকীবের হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে মেলে ধরে চোখের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে মনিরার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। চিঠিতে লেখা আছে—

এসেছি, চলে এসো।

'বনহুর'

বললো মনিরা—আচ্ছা, গিয়ে বল্ আমি আসছি!

নকীব মনে করলো, আপামনির পরিচিত কেউ হবে, তাই সে বিলম্ব না করে চলে গেলো নীচে।

বনহুর আজ নতুন ড্রেসে সজ্জিত হয়ে এসেছে। শরীরে তার রাজকীয় পোষাক। চোখে চশমা, নকল গোঁফ শোভা পাচ্ছে নাকের নীচে। মাথায় একটা নতুন ধরনের ক্যাপ। ইলেকট্রিক আলোতে বনহুরের পোষাকগুলি ঝক্ ঝক্ করছে।

মনিরা এসে দাঁড়ালো বনহুরের সম্মুখে।

প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেলেও সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলো স্বামীকে। খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো মনিরার মুখমন্ডল।

উভয়ে তাকিয়ে আছে উভয়ের দিকে।

নকীব অবাক হয়ে গেলো আপামনি, আপনি ওনাকে—আপনি—হাঁ, আমি ওকে চিনি। আমাদের আত্মীয়। চলুন, উপরে চলুন। নকীবকে শোনাবার জন্যই স্বামীকে আপনি বলে সম্বোধন করলো মনিরা।

বনহুর আর মনিরা উপরে এসে বসলো।

মনিরা বললো—আজ এ ভাবে না এলে কি তোমার চলতোনা?

সন্ধ্যারাতে আসা কি সহজ আমার পক্ষে? বিলম্ব করোনা মনিরা, বহুদূর যেতে হবে।

তোমার জন্য কিছু খাবার তৈরী করে রেখেছি।

হাতঘড়ির দিকে তাকালো বনহুর বললো—ফিরে এসে খাবো।

একটুও মুখে দেবেনা?

না, চলো গাড়ী নীচে অপেক্ষা করছে।

মনিরা যখন রাজকুমারকে ঘরে নিয়ে এলো, তখন নকীবের মনে কেমন যেন একটু সন্দেহ জেগেছিলো। বিশেষ করে বেগম সাহেবা বাসায় নাই, এমতঅবস্থায় একটা অজানা লোককে—একেবারে আপামনির ঘরে...না, এ ঠিক একটা অভিসন্ধি নিয়ে এসেছে। নকীব কান পেতে সব শুনতে লাগলো।

বনহুর যখন মনিরাকে বলছিলো, চলো গাড়ী অপেক্ষা করছে, তখন নকীবের রাগে মুখ কালো হয়ে উঠলো। নিশ্চয়ই কোন দুষ্ট লোক তার আপামনিকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এসেছে। দরজার পাশে পথরোধ করে দাড়িয়ে রইলো নকীব। কিছুতেই আজ আপামনিকে ওর সঙ্গে বাইরে যেতে দেবেনা—কিছুতেই না। রাজকুমার আর যেই হোক, নকীব খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মনিরার হাসির শব্দ ভেসে আসছে কক্ষমধ্য হতে, বলছে মনিরা—কতদূর সেই নাহার মঞ্জিল?

অনেক দূর, সেখানে পৌঁছতে রাত অনেক হবে।

তাহলে কখন ফিরে এসে খাবে?

যখন আসি, তখন খাবো।

একটু খাও।

না মনিরা, এখন কিছু খাবোনা। ফিরে এসে ক্ষুধা পাবে, তখন দু'জন মিলে খাবো।

চলো।

বনহুর আর মনিরা দরজায় এসে অবাক! দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

নকীব দরজা বন্ধ করে দিয়েছে বাইরে থেকে, যেতে দেবেনা সে আপামনিকে রাজকুমারের সঙ্গে।

মনিরা যখন দরজা ধরে টানাটানি করছে তখন নকীব বললো—আমি তোমাকে যেতে দেবোনা আপামনি। কিছুতেই না।

মনিরা অবাক হলো, বললো—সে কি!

হাঁ, আম্মা ফিরে না আসা অবধি তোমাদের আমি কিছুতেই বেরুতে দেবো না।

কেনো? কক্ষমধ্য হতে বললো মনিরা।

দরজার ওপাশ থেকে জবাব দিলো নকীব—তুমি রাজকুমারের সঙ্গে কোথায় যাবে?

হাসলো মনিরা—যেখানে খুশী।

তা হবেনা। বললো নকীব।

মনিরা আর বনহুর নকীবের কথায় মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে হাসলো। বললো মনিরা—নকীব সব গোলমাল করে ফেললো।

বনহুর বললো—চলো, ওদিকের জানালা দিয়ে পালাই।

কিন্তু আমি?

তোমাকে আমি পার করে নিচ্ছি।

ওরে বাবা, ওদিকে তাকালেই অমনি অজ্ঞান হয়ে যাবো।

এলো.....মনিরার হাত ধরে বনহুর পিছন শার্শী দিয়ে বেরিয়ে কার্নিশের উপর এসে দাঁড়ালো।

অতি সাবধানে, কৌশলে মনিরাকে নিয়ে বনহুর এক সময় নেমে এলো গাড়ীর পাশে।

ওদিকে নকীব দরজায় শিকল আট্‌কে বসে রইলো দরজার পাশে।

বেশ কিছু সময় পর ফিরে এলেন মরিয়ম বেগম আর সরকার সাহেব।

নকীব তখন দরজায় ঠেস দিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে।

মরিয়ম বেগম এসে নকীবকে এভাবে দরজায় ঠেস দিয়ে বসে থাকতে দেখে অবাক হলেন, ব্যাপার কি বুঝতে না পেরে বললেন—একি! নকীব তুই এখানে? আমি তোকে খুঁজে মরছি!

মরিয়ম বেগমের কথায় ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো নকীব, আমতা আমতা করে বললো—আপনি এসেছেন বেগম সাহেবা?

হাঁ, মনিরা কোথায়?

ঘরে।

তা এখানে দরজায় অমন করে বসে আছিস্ কেনো?

ঢোক্ গিলে বললো নকীব—ওদের ঘরে আটকে রেখেছি।

ওদের—কাদের?

ওই যে আপামনি আর কে একজন রাজকুমার না কে......

রাজকুমার?

হাঁ, লোকটা আপামনিকে নিয়ে পালাতে যাচ্ছিলো, আমি তাই ওদের দু'জনকে আটকে রেখেছি ঘরের মধ্যে.....

নকীবের কথায় মরিয়ম বেগমের দু'চোখ কপালে উঠে, মুখখানা গম্ভীর বিবর্ণ হয়ে উঠে, বলেন তিনি—দরজা আটকে বসে আছিস কি হতভাগা বাবা। দরজা খোল, দরজা খোল্ দেখি।

নকীব দরজা খুলে দিলো।

কিন্তু একি! ঘরের মধ্যে ফাঁকা, লোক কোথায়?

মরিয়ম বেগম কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অবাক হলেন।

পিছনে নকীব, তার চোখেমুখে রাজ্যের বিস্ময়। যে কারণে সে দরজা বন্ধ করে পাহারা দিচ্ছিলো, তবু রাজকুমার তার আপামনিকে নিয়ে পালিয়েছে।

মরিয়ম বেগম নকীবের দিকে তাকাতেই হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো—আম্মা সাহেব, আমি প্রথমেই সন্দেহ করেছিলাম, রাজকুমার না কে একটা লোক এসে বললো, বাড়ীতে কেউ আছে?

তুই কি বললি? প্রশ্ন করলেন মরিয়ম বেগম।

নকীব কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিলো—আমি বললাম—আম্মা নেই সরকার সাহেব নেই.....

মরিয়ম বেগম রেগে উঠলেন—মাথা আর মুন্ড, ও সব না বললে কি চলতোনা?

আমি কি অতোশত জানি যে, লোকটা কু'মতলব নিয়ে এসেছে!

তারপর কি বলেছিলি তুই?

বলেছিলাম, কেউ নেই, শুধু আপামনি আছে।

ঐ তো সর্বনাশ করেছিলি।

আমার ভুল হয়ে গেছে আম্মা সাহেব! লোকটা বললো, আমি রাজকুমার, তোমার আপামনির সঙ্গেই দেখা করতে চাই।

আর তুই মনিরাকে ডেকে নিয়ে গেলি বুঝি?

না, আমি এসে আপামনিকে সব বললাম, আপামনি তো কথাটা শুনে রেগে আগুন—কোথাকার কে রাজকুমার, আমি কেনো যাবো তার সংগে দেখো করতে। আমি গিয়ে আপামনির কথাটা তাকে বললাম।

মরিয়ম বেগম অবাক হয়ে শুনছিলেন নকীবের কথাগুলো আর মনে মনে ভাবছিলেন, কেনো তিনি আজ বাইরে গেলেন। বাসায় থাকলে এমন তো হতো না। নকীবের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন তিনি।

নকীব বলে চলেছে—রাজকুমার আমার কথা শুনে মুচ্‌কি হাসলো। একটা চিঠি লিখে আমার হাতে দিয়ে বললো, তোমার আপামনিকে দাও গে।

তারপর? অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মরিয়ম বেগম।

আপামনিকে চিঠিটা এনে দিলাম, ছোট্ট একটু চিঠি। আপামনি চিঠিটা পড়ে বললেন—বল্‌গে আসছি। জানেন আম্মা, আপামনি তক্ষুণি নীচে নেমে এলো রাজকুমারের কাছে। আমিও তার পিছনে পিছনে এলাম—কেউ তো আর নেই, তাই। আপামনি রাজকুমারকে দেখেই খুশীতে ডগমগ হলো।

নকীবের কথায় মরিয়ম বেগমের মুখ অনেকটা প্রসন্ন হয়ে এসেছে, বললেন—তারপর?

তারপর আপামনি আমাকে বললেন—ইনি আমাদের আত্মীয় হন, একে উপরে নিয়ে আয়। আপামনির কথা শুনে রাজকুমার খুশী হলো, আপামনির সংগে চলে এলো উপরে।

তাই নাকি?

হাঁ। বলে মাথা নত করলো নকীব, গলার স্বর নীচু করে বললো—আপামনি রাজকুমারের সংগে খুব হাসাহাসি—চুপ করে গেলো নকীব।

মরিয়ম বেগম বুঝতে পারলেন—রাজকুমারটা কে। মনির ছাড়া কেউ নয় টের পেয়ে গেলেন তিনি। হেসে বললেন—রাজকুমার মনিরাকে নিয়েই ভেগেছে।

হাঁ আম্মা, সাহেবা। নকীব মরিয়ম বেগমের মুখে হাসির আভাষ দেখে বিস্মিত হলো। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে সে মনিব গৃহিণীর দিকে।

মরিয়ম বেগম বললেন—চিন্তার কোন কারণ নেই নকীব, রাজকুমার আমাদের আত্মীয়ই হয়!

কিন্তু......

ওরা তোকে অবাক করার জন্য পিছন জানালা দিয়ে কোথাও বেড়াতে গেছে, এই এলো বলে।

এতোক্ষণে নকীবের মন থেকে যেন পাষাণ ভার নেমে যায়। আশ্বস্ত নয় নকীব।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে খাবারের ঢাকনা তুলে দেখলেন, একি! খাবারগুলি যেমনকার তেমনি আছে তো। তবে নিকটে কোথাও গেছে ওরা—এখনই ফিরে আসবে।

মরিয়ম বেগম টেবিলের খাবারগুলি আবার সুন্দর করে চাপা দিয়ে রাখলেন।

❑

জনহীন পথ বেয়ে বনহুর আর মনিরার গাড়ীখানা স্পীডে ছুটে চলেছে। ড্রাইভ করছে স্বয়ং বনহুর। পাশে বসে আছে মনিরা।

এসব পথে ইলেকট্রিক আলো না থাকলেও লণ্ঠনযুক্ত লাইট পোষ্ট ছিলো। আলো তেমন তীব্র না হলেও পথ পরিস্কার দেখা যাচ্ছিলো। গাড়ী চালাতে কোন কষ্ট হচ্ছিলোনা বনহুরের।

পথের দুই ধারে ঘন শালবৃক্ষগুলি নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে সোজা হয়ে। আকাশে অসংখ্য তারার মালা ফুটে উঠেছে। বাতাস বইছে সাঁ সাঁ করে।

বনহুরের ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেটের আগুনটা জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। মনিরা তাকিয়ে দেখছে মাঝে মাঝে স্বামীর মুখখানা। অস্পস্ট হলেও বড় সুন্দর লাগছে ওকে। মনিরার হৃদয়ে একটা অভূতপূর্ব আনন্দ নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। তার মত স্বামীভাগ্য এ পৃথিবীতে বুঝি আর কারো হয়নি। কে বলে মনিরা অসুখী—কে বলে সে দুঃখী।

মনিরার মনে কত কথা উঁকি দিয়ে যাচ্ছে, একটির পর একটি করে। আজ কেনো যেন বার বার স্বামীর মুখখানাই দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে মনিরার, কেনো যেন মনে হচ্ছে—একটু স্বামীর কোলে মাথা রেখে শুতে পারতো! একটু যদি হাতখানা রাখতো তার হাতের উপরে...একি! আজ এমন লাগছে কেনো। এতো কাছে রয়েছে স্বামী, তবু কেমন যেন ফাঁকা লাগছে, কেমন যেন দুরু দুরু করছে বুকের ভিতরটা। তবে কি নূরের জন্য এমন লাগছে তার!

উদাস ভাবে মনিরা তাকিয়ে আছে গাড়ির সম্মুখের দিকে।

বনহুর মনিরার মৌনভাব লক্ষ্য করে বললো—কি ভাবছো মনিরা?

স্বামীর কথায় সন্বিৎ ফিরে পায় মনিরা, বলে—আর কতদূর সেই নাহার মঞ্জিল?

এই তো প্রায় এসে গেছি। কিন্তু মনিরা, আমি বুঝতে পারছিনে এই নাহার মঞ্জিলে আসবার তোমার এতো সখ হলো কেনো?

বলছি, ও কথা বলবোনা। তুমি শুনতে চেওনা এখন।

তবে কখন বলবে?

নাহার মঞ্জিলে পৌছে.ঐ দেখো চাঁদ উঠেছে। মনিরা আংগুলি দিয়ে দেখিয়ে দেয় পূর্ব আকাশটা।

বনহুর একবার তাকিয়ে দেখে নেয়, শালবনের শাখার ফাঁকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঁকি ঝুঁকি মারছে। বললো বনহুর—ভালই হলো নাহার মঞ্জিল কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠবে। মনিরা, নাহার মঞ্জিল দেখতে তোমার কোন কষ্ট হবেনা।

হাঁ, চাঁদটা আমাদের আলোর কাজ করবে।

মনিরা!

বলো?

তুমি খেয়ে আসতে বলেছিলে কিন্তু না খেয়ে ভুল করেছি—বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে।

সত্যি আমার খুব খারাপ লাগছে। কত রাতে ফিরবো তবেই খাবে।

না, ফিরতে তেমন বিলম্ব হবে না মনিরা। ফিরেই আমরা দু'জনা একসঙ্গে খাবো তখন।

এবার গাড়ীখানা বেশ উঁচুনীচু পথ বেয়ে এগুতে লাগলো। ঝোপঝাড় আর আগাছা ভরা পথের দু'পাশ। মাঝে মাঝে শিয়াল আর ফেউ আর ডাক শোনা যাচ্ছে।

মনিরা স্বামীর গা ঘেষে বসলো।

হেসে বললো বনহুর—ভয় পাচ্ছো?

না।

মনিরা মুখে না বললেও অন্তরে অন্তরে কেমন যেন একটা ভীত ভাব মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগলো। যদিও স্বামী পাশে থাকতে তার কোন ভয় নেই, তবুও নারী মন একটুতেই চমকে উঠে।

মনিরার গলার স্বর লক্ষ্য করে হেসে বললো বনহুর—ভয় তো পাচ্ছোনা কিন্তু নাহার মঞ্জিলে গিয়ে ভয় পেলে চলবে না কিন্তু?

মনিরা শুনেছিলো—এখানে নাহারের কবর আছে, নবাব জামরুদ এই কবরের পাশে একদিন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলো। কথাগুলো মনে হওয়ায় মনিরার মনের সাহস সব উবে গেলো কর্পূরের মত। আগে তো এমন করে ভেবে দেখেনি, ভেবেছিলো—নাহার মঞ্জিলে এমন কি আছে! কিন্তু এখন এসব কথা স্বরণ হতেই দুরু দুরু করে বুকটা কেঁপে উঠলো। বিশেষ করে রাতের বেলায় এটা কি ভাল হলো। কিন্তু তখনই ভেসে উঠলো হৃদয়ের ধন নূরের মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সাধক বাবাজীর ভবিষ্যাৎ বাণী....নাহার মঞ্জিল মে তুমহারা বেটা মিল জায়েগা। নাহার মঞ্জিল মে...মুহূর্তে মনিরার মনের ভয়-ভাবনা দুর হয়ে যায়।

বলে মনিরা—তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়ে ভয় পাবো নাহার মঞ্জিলে গিয়ে, কি যে বলো!

মনিরার সাহসভরা কণ্ঠস্বর শুনে বনহুর আনন্দিত হলো।

আরও কিছুটা চলার পর বনহুর বললো—ঐ যে দেখা যাচ্ছে নাহার মঞ্জিল।

মনিরার বুকটা হঠাৎ যেন ধক্ করে উঠলো। বুকের মধ্যে কেমন যেন ঢিপ ঢিপ করছে। সম্মুখে তাকিয়ে অবাক হলো মনিরা, কৃষ্ণপক্ষের চাঁদের আলোতে দেখলো—মস্তবড় একটা পাথরের মত কোন জিনিষ, মাথা উঁচু

করে দাঁড়িয়ে আছে। খুব স্পষ্ট না দেখা গেলেও বেশ বুঝা যাচ্ছে—ওটা পাহাড় নয়, একটা ভগ্ন বাড়ীর ধংসাবেশেষ। সুউচ্চ বাড়ীটার সিড়ির ধাপগুলি ক্রমান্বয়ে নেমে এসেছে নীচে।

চাঁদের আলোত নাহার মঞ্জিল ধুসর বর্ণের মনে হচ্ছিলো।

বনহুরের গাড়ী গিয়ে থামলো নাহার মঞ্জিলের পাদমূলে সিড়ির ধাপগুলির নীচে।

গাড়ী রেখে নেমে দাঁড়ালো বনহুর, মনিরাকে লক্ষ্য করে বললো—এসো। হাত বাড়িয়ে দিলো বনহুর মনিরার দিকে।

মনিরা স্বামীর হাতের উপর হাত রেখে নেমে দাঁড়ালো।

উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে একবার হাসলো।

গাড়ী রেখে বনহুর আর মনিরা সিড়ি বেড়ে উঠতে লাগলে উপরের দিকে।

সিড়ির ধাপগুলো যেমন লম্বা তেমনি প্রশস্ত। স্থানে স্থানে ভেংগে ধসে গেছে, ঝোপঝাড় আর আগাছা জন্মেছে সেই ধসে পড়া স্থানে।

বনহুর মনিরার হাত ধরে এগিয়ে চলেছে।

চাঁদের আলোতে নাহার মঞ্জিল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, ওদের চলতে কোন কষ্ট হচ্ছেনা।

দিনের আলোতে যে স্থানে মানুষ প্রবেশ করতে ভয় পায়, সেই স্থানে বনহুর হাসিমুখে এগুতে লাগলো, এতটুকু ভয় বা দুশ্চিন্তা তার মনে রেখাপাত করলোনা বা করেনি।

দুঃসাহসী দস্যু বনহুর স্ত্রীর হাত ধরে নাহার মঞ্জিলের সিড়ির ধাপগুলি অতিক্রম করে চলেছে।

যতই এগুচ্ছে ওরা ততই মনিরার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। বড় অস্বস্তি বোধ করছে সে—এতোক্ষণ নূরের চিন্তায় মনটা তার আচ্ছন্ন ছিলো, কিন্তু এই মুহূর্তে সব যেন ভুলে গেল মনিরা। বনহুরের হাতের মধ্যে মনিরার হাতখানা ঘেমে উঠতে লাগলো।

বনহুর বললো—কি হলো তোমার মনিরা?

না কিছুনা।

বনহুর বুঝতে পারলো, মনিরার গলা কাঁপছে।

অভয় দিয়ে বললো বনহুর—ভয় পাচ্ছো?

না।

বনহুর আর মনিরা এসে সিড়ির উপর ধাপে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ নীরবে তাকিয়ে রইলো নাহার মঞ্জিলের দিকে। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বনহুর বললো—মনিরা, এখানে এলেই আমি শুনতে পাই একটা অতৃপ্ত হৃদয়ে করুণ হাহাকার।

মনিরা অবাক স্বামীর মুখে তাকিয়ে বললো—কার?

নবাব জামরুদীর। বেচারা জামরুদীর বাসনা পূর্ণ হয়নি।

মনিরা বললো—তুমি পুরুষ, তাই নবাব জামরুদীর হৃদয়ের হাহাকার শুনতে পাও, আর যে শত শত নারীর ইজ্জৎ রক্ষার্থে জীবন দিলো, সেই নাহারের কথা মনে হয় না তোমার?

শত শত নারীর ইজ্জৎ সে রক্ষা করেছে সত্য কিন্তু সে নিজের স্বামীকে ধোকা দিয়ে অপরাধী হয়েছে। জানো মনিরা, নাহার বিয়ে করেছিলো জামরুদীকে, কিন্তু.....

থাক আর শুনতে চাইনে। বললো মনিরা।

বললো বনহুর—চলো ভিতরে যাই।

ভিতরে যাবোনা।

কেনো?

মন আমার কেমন করছে?

ও কিছু না, চলো। মনিরার হাত ধরে নাহার মঞ্জিলে প্রবেশ করলো বনহুর।

মনিরা চারিদিকে ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে তাকাতে লাগলো, কোথায় তার নূর। সাধক বাবাজী বলেছিলেন, নাহার মঞ্জিলে তার নূরকে পাবে, কিন্তু কোথায় নূর?

মনিরার মনের চঞ্চলতা লক্ষ্য করে বললো বনহুর—অমন করে কি দেখছো মনিরা?

না, কই কিছু না তো?

তোমাকে যেন বড্ড অন্যমনস্ক লাগছে!

না না, কিন্তু....

থামলে কেনো, বলো, বলো মনিরা কি বলতে চাইছিলে?

বলবো, বলবো তোমাকে?

বলো মনিরা, বলো?

না না, ও কথা বলতে মানা আছে, বলতে মানা আছে।

বলতে মানা? অবাক কণ্ঠে বললো বনহুর।

মনিরা বললো—চল ফিরে যাই।

কেনো এলে, কেনোই বা ফিরে যেতে চাচ্ছো—কি হয়েছে তোমার?

চলো ফিরে যাই.....

বলো কেনো এলে এখানে?

বনহুরের কথা শেষ হয়না, মুহূর্তে অসংখ্য পুলিশ বাহিনী উদ্যত রাইফেল হস্তে ঘিরে ধরে বনহুরকে।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী গুলীভরা পিস্তল চেপে ধরলেন বনহুরের বুকে। নিমিষে এ কাজ করলেন মিঃ আহম্মদ, মিঃ জাফরী ও তার পুলিশ বাহিনী।

বনহুর দেখলো—আচম্‌কা যাদুর মত অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ ফোর্স তার চারিপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে।

মিঃ আহম্মদ দাঁতে দাঁত পিষে বললেন—দস্যু, হাত উঠাও।

বনহুর ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো।

মনিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেদিকে তাকাচ্ছে অসংখ্য পুলিশ আর উদ্যত রাইফেল ছাড়া কিছুই নজরে পড়ছেনা। মনিরা কণ্ঠ শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছেনা। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হলোনা।

মিঃ আহম্মদ রিভলভবার বনহুরের বুকে চেপে ধরে মিঃ জাফরীকে বললেন—ওর পকেট থেকে রিভলবার বের করে নিন।

মিঃ জাফরী পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে নিলেন।

মিঃ আহম্মদ এবার বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলেন।

মনিরা স্বামীর এই অবস্থা দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। এতোক্ষণে সে বুঝতে পারলো—নূরের সন্ধানে এসে স্বামীকে সে হারালো। কোন পুলিশের গুপ্তচর তার স্বামীকে বন্দী করবার জন্যই এই ফন্দি এঁটেছেলো এবং সাধক সেজে গিয়েছিলো তার কাছে, বলতে মানা করেছিলো সব কথা....মনিরার মনে সব কথাগুলি যেন হুড়োহুড়ি করে ভীড় পাকাতে লাগলো।

মিঃ আহম্মদ বললেন—মিসেস মনিরা আপনি আপনার স্বামীকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে যে উপকার করলেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বনহুর তাকালো মনিরার দিকে।

মনিরা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলো, অপরাধীর মত মাথা নত করে নিলো সে। কত বড় অপরাধ সে করেছে এবার মর্মে মর্মে অনুভব করলো। দুঃখ, বেদনা, ক্ষোভে মুষড়ে পড়লো মনিরা, নিজের শরীরের মাংস নিজেই চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করছিলো তার।

বনহুরের মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠেছে, মনিরাই কি আজ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিলো। তাকে এ ভাবে মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়ে নাহার মঞ্জিলে নিয়ে আসার পিছনে কি এই অভিসন্ধি ছিলো মনিরার? গতকাল রাতে মনিরার কথাগুলো স্মরণ হতে লাগলো বনহুরের। নাহার মঞ্জিলে আসার তার সেকি উন্মাদনা, সেকি আগ্রহ। বনহুরের মনে সন্দেহের ছোয়া গভীর হয়ে এলো। একটি কথা বনহুর বললোনা—বলতে পারলোনা।

মনিরার মুখ দিয়েও কোন কথা সরলো না।

অসংখ্য পুলিশ ফোর্স বনহুরের চারিপাশে রাইফেল উদ্যত করে তাকে নিয়ে চললো।

নাহার মঞ্জিলের পিছনে একটা ঝোপের আড়ালে পুলিশ ভ্যানগুলি অপেক্ষা করছিলো। বনহুরকে এই ভ্যানে তুলে নেওয়া হলো।

মনিরার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। বনহুরকে যখন পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া হলো, উচ্ছাসিতভাবে কেঁদে উঠলো মনিরা—ছুটে গেল পুলিশ ভ্যানের পাশে।

লৌহ শিকল দিয়ে বনহুরকে তখন পুলিশ ভ্যানের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হয়েছে। হাতে হাতকড়া। বুকে পিঠে এবং দেহের চারপাশে উদ্যত পিস্তল আর রাইফেল।

বনহুর ফিরে তাকালো ক্রন্দরনতর মনিরার দিকে।

মনিরা কেঁদে বললো—আমাকেও নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে।

বনহুর কিছু বলতে যাচ্ছিলো ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ী ছেড়ে দিলো।

মনিরা চিৎকার করে উঠলো—আমি কি করবো, কোথায় যাবো, বলে গেলেনা। ওগো, আমি কোথায় যাবো---

মনিরার কণ্ঠস্বর আর শুনতে পেলোনা বনহুর।

পুলিশ ভ্যানগুলি এক সংগে ছুটতে লাগলো।

মাঝখানের গাড়ীতে বনহুর, সামনে আর পিছনে পরপর প্রায় সাতখানা ভ্যান স্পীডে ছুটে চললো।

মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী তখনও মনিরার পাশে দাঁড়িয়ে আরও দু'জন পুলিশ অফিসার রয়েছে সেখানে।

মিঃ আহম্মদ বললেন—মিসেস মনিরা, ক্ষমা করবেন, সেদিনের সাধক অন্য কেহ নয়—আমি। আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহম্মদ। একটু থেমে বললেন তিনি—আমাদের কার্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার আপনাকে যথোচিত সম্মানের সঙ্গে বাড়ীতে পৌছে দেওয়া হবে। মিঃ জাফরীকে লক্ষ্য করে বললেন মিঃ আহম্মদ মিঃ জাফরী আপনি একে এর বাড়ীতে পৌছে দিন, আমি পুলিশ ভ্যানগুলির সংগেই চললাম।

মিঃ জাফরী বললেন—আচ্ছা, আপনি পুলিশ ভ্যানগুলির সংগেই যান। কারণ, শয়তান দস্যু--

মনিরা তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলো —খবরদার! শয়তান বলবেন না। দস্যু হলেও সে শয়তান নয়।

মিঃ জাফরী হেসে বললেন—ভুল হয়েছে, আসুন আপনাকে পৌছে দিয়ে আসি।

মনিরা দৃঢ়কণ্ঠে বললো—আমি কারো সাহায্য চাইনে ইন্সপেক্টার। আমার গাড়ী আছে--

এই —এতো রাতে একা একা যাবেন? বললেন মিঃ আহম্মদ।

মনিরা বললো—দস্যুপত্নী এতো সহজে ভয়পাবার নয়। কথা শেষ করে মনিরা নিজের গাড়ীখানা যেদিকে দাঁড়িয়েছিলো। সেই দিকে অগ্রসর হলো।

মিঃ আহম্মদ বললেন—মিঃ জাফরী, ও নিজে গেলেও আপনি মিঃ হারুন ও মিঃ করিমকে নিয়ে আপনার গাড়ীতে যান। মেয়ে—মানুষ—একা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

আচ্ছা তাই যাচ্ছি। মিঃ জাফরী পুলিশ অফিসারদ্বয় সহ নিজ গাড়ীতে উঠে বসলেন।

মিঃ আহম্মদ চললেন নিজ গাড়ীর দিকে।

❑

ক্রমে রাত বেড়ে আসছে তবু মনিরার ফিরে আসার কথা নেই। মরিয়ম বেগম ঘরবার করছেন। বার বার রেলিং এর পাশে ফিরে এসে পথের দিকে তাকাচ্ছেন, কোথায় গেলো—এতোক্ষণেও ফিরে আসছেনা কেনো। টেবিলে খাবার ঢাকা রয়েছে, নিশ্চয়ই এক্ষুণি অসবে বলেই কোথাও গিয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ ঢলে পড়লো পশ্চিম আকাশে। সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে সমস্ত পৃথিবীটা।

মরিয়ম বেগম অস্থির চিত্ত নিয়ে কখনও বিছানায় শুচ্ছেন, কখনও গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন রেলিং এর পাশে। কখনও আবার ফিরে এসে চেয়ারে বসছেন। মনের দুশ্চিন্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তার সারা মুখে।

এ বাড়ীর জন্য চিন্তা করবার আর কে আছে একমাত্র তিনি ছাড়া। স্বামীর জীবিত অবস্থায় যা কিছু ঘটতো বা হতো—বেশীর ভাগ ভাবতে হতো চৌধুরী সাহেবকে। আর আজ সবকিছু দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনা, যতি ঝড়ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে তারই মাথার উপর দিয়ে।

চৌধুরী সাহেবের মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্যন্ত কত না দুর্ঘটনা ঘটে গেছে, নীরবে হজম করেছে মরিয়ম বেগম। বুকের ভিতরটা যেনতার পোড়া কয়লার মত কালো হয়ে গিয়েছিলো। কত আর সহ্য হয়, সবেরই তো একটা সীমা আছে। চৌধুরী সাহেবের অপমৃত্যু তার পাঁজরের হাড়গুলো যেন গুড়ো করে দিয়ে গিয়েছিলো। নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাস—তাকে শুধু একবার নয় বার বার নিষ্পেষিত করে চলেছিলো।

মরিয়ম বেগম দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়লেন।

বিছানায় শুয়ে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না, কোথায় গেলো মেয়েটা। সত্যিই যদি মনির না হয়ে অন্য কোন লোক ওকে ছলনা বা চালাকী করে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে---কি সর্বনাশ হবে তাহলে।

কি ভুলই না তিনি আজ করেছিলেন, বাসায় থাকলে অমন হতোনা মনিরাকে----

মরিয়ম বেগমের চিন্তায় বাধা পড়লো।

নীচে গাড়ী বারেন্দায় শোনা গেলো গাড়ী থামার শব্দ।

মরিয়ম বেগমের কানে শব্দটা পৌঁছতেই একটা অনাবিল শান্তির ধারা তার সমস্ত মনের আকাশে প্রলেপ দিয়ে গেলো। তিনি শয্যা ত্যাগ করে উঠে পড়লেন দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নীচে গেলেন।

নকীব সিঁড়ি ঘরের বারেন্দায় নাক ডেকে ঘুমাচ্ছিলো, মরিয়ম বেগম তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন—দেখতো নকীব, কে এলো?

চোখ রগড়ে উঠে বসলো নকীব, মনিব, গৃহিনীকে এতো রাতে নীচে দেখে অবাক হয়ে বললো—আম্মা সাহেবা যে?

দেখতো কে যেন এলো? গাড়ীর শব্দ পেলাম।

নকীব দরজা খুলে দিতেই কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরা সম্মুখে মরিয়ম বেগমকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো তাঁর গলা সঙ্গে সঙ্গে আকুলভাবে কেঁদে উঠলো—মামীমা!

মরিয়ম বেগম স্তব্দ হয়ে গেলেন, হঠাৎ কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। তিনি মনিরার পিছনে দরজার দিকে লক্ষ্য করছিলেন , কে সেই রাজকুমার যার সঙ্গে মনিরা গিয়েছিলো। মরিয়ম বেগম ভেবেছেন, মনিরা যার সংগে গিয়েছে আবার তার সংগেই ফিরে এসেছে। তাই বার বার তাকাচ্ছিলেন তিনি দরজার দিকে। একটা দারুণ উৎকুণ্ঠা জাগছিলো তার মনের মধ্যে।

মনিরা উচ্ছ্বসিতভাবে কেঁদে চলেছে। এতোক্ষণ যে জমাট বেদনা তার বুকের মধ্যে চাপ ধরে উঠেছিলো, এতক্ষণে তা যেন ঝরে পড়তে লাগলো অঝোরে।

মরিয়ম বেগম কিছু বলতে যাবেন সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলেন মিঃ জাফরী ও দুইজন পুলিশ অফিসার।

মরিয়ম বেগম পুলিশ অফিসারদ্বয়কে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড়টা টেনে ঠিক হয়ে দাঁড়ালেন।

মিঃ জাফরী ও পুলিশ অফিসারদ্বয় মরিয়ম বেগমকে আদাব জানালেন।

মিঃ জাফরী বললেন—মিসেস চৌধুরী, আমাকে হয়তো চিনতে পেরেছেন, আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ জাফরী, আর এরা আমার সহকারী পুলিশ অফিসার। মিসেস মনিরাকে পৌঁছে দেবার জন্যই আমরা এতো রাতে এখানে এসেছি।

মরিয়ম বেগম কৃতজ্ঞতা পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে একবার তাকালেন মিঃ জাফরী পুলিশ অফিসারদ্বয়ের মুখের দিকে। তিনি মনে করলেন —মনিরাকে কোন দুষ্ট লোক ধরে নিয়ে গিয়েছিলো বা ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো, এরা উদ্ধার করে নিয়ে এলেন।

পুলিশ অফিসারদ্বয় মনিরার গাড়ীকে অনুসরণ করেই এখানে এসেছেন। যদিও মনিরা রাগ করে নিজেই গাড়ীখানা ড্রাইভ করে বাড়ীর পথে অগ্রসর হয়েছিলো, তবুও পুলিশ অফিসারগণ তাকে একা ছেড়ে দেবার ভরসা পাননি। পিছনে পিছনে তাদের গাড়ীখানা মনিরার গাড়ীখানাকে ফলো করেছিলো।

মিঃ জাফরী ও পুলিশ অফিসারদ্বয়কে বসার জন্য অনুরোধ জানালেন মরিয়ম বেগম। বললেন তিনি—আপনারা বসুন।

মরিয়ম বেগম এখনও জানেন না—পুলিশ অফিসারগণ আজ এই মুহূর্তে তার হৃদয়ের ধনকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করেছে। জানলে হয়তো তিনি এমন সচ্ছমনে তাদেরকে সমাদর জানাতে পারতেন না।

হাজার হলেও মা, গর্ভধারিনী জননী, পুত্র যতই দুষ্ট অশান্ত হোক, কোন মা,ই তার অমঙ্গল কামনা করতে পারে না। মরিয়ম বেগম সময় সময় তার সন্তান মনিরের উপর খুব রাগ করতেন কিন্তু পারতেন না তাকে অন্তর থেকে কোন অভিশাপ করতে।

মিঃ জাফরী বুঝতে পারলেন, মিসেস চৌধুরী এখনও কিছু বুঝতে পারেন নি! কাজেই তিনি বললেন—মিসেস চৌধুরী, আমরা আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে পারছি নে, কারণ এক্ষুণি আমাদের চলে যেতে হবে। একটু থেমে বললেন—আমাদের ক্ষমা করবেন, আজ আমরা আপনার পুত্র দস্যু বনহুরকে গ্রেফতার করেছি।

মরিয়ম বেগম মিঃ জাফরীর মুখে থেকে তড়িৎ গতিতে তাকালেন মনিরার মুখে।

মনিরা তখন নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলো।

মরিয়ম বেগমের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই মাথা নত করে অধর দংশন করতে লাগলো।

মনিরার অশ্রুকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই তিন হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এবার সব স্পষ্ট হয়ে এলো তার কাছে। বুঝতে পারলেন, অমন একটা ঘটনা ঘটে গেছে যা অতি মর্মান্তিক —নিদারুণ।

মরিয়ম বেগমের মুখভাব লক্ষ্য করে বললেন মিঃ জাফরী—মিসেস চৌধুরীর, বুঝতে পারছি এ সংবাদ আপনার হৃদয়ে দারুণ আঘাত করেছে। কিন্তু কি করবো, আপনার সন্তান হলেও আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারিনে। আইনের চোখে সে অপরাধী, কাজেই কর্তব্যের ----

এবার বলে উঠলো মনিরা—মিথ্যা ছলনায় আমাকে ভুলিয়ে আপনার কর্তব্য পালন করেছেন। মিথ্যাই কি আপনাদের পেশা?

মিঃ জাফরী হাসলেন—ন্যায় কার্য্যে মিথ্যার চেয়ে আরও কিছু করতেও আমরা রাজি আছি।

বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম—আমার মনির আজ কি করেছিলো? কি অন্যায় সে করেছিলো আজ?

অন্যায় আজ না করলেও সে গুরুতর অপরাধী। তাকে যে কোন মুহূর্তে গ্রেফতার করা পুলিশ বাহিনীর কর্তব্য। বললেন মিঃ জাফরী।

মরিয়ম বেগমের গন্ড বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। গম্ভীর স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

মিঃ জাফরী ও পুলিশ অফিসারদ্বয় মরিয়ম বেগমকে পুনরায় আদাব জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মিঃ জাফরী মরিয়ম বেগমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শুধু তিনিই নন—সমস্ত পুলিশ বাহিনী চৌধুরী পরিবারকে সব সময় সমীহ করে চলতেন কারণ বংশ মর্যদার বা আভিজাত্যের দিক দিয়ে কোন অংশে তারা কম ছিলেন না। তাছাড়া দস্যু বনহুরকে পুলিশ বাহিনী ভালোচোখে না দেখলেও তার সম্বন্ধে ভিতরে ভিতরে মস্তবড় একটা মনোভাব পোষণ করতো সবাই।

মিঃ জাফরী বিদায় গ্রহণ করতেই মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন— কি বলছিস মনিরা, ওকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে?

হাঁ মামীমা! কম্পিত গলায় বললো মনিরা।

মরিয়ম বেগম বললেন—কি হয়েছিলো? কি করে আমার মনিরা বন্দী হলো মনিরা?

চলো মামীমা, সব বলছি।

মনিরা আঁচলে চোখ মুছে মামীমাকে অনুসরণ করলো।

সিড়ি বেয়ে এগিয়ে চললো তারা, নকীবও চললো তাদের পিছনে পিছনে। ওর কাছে সব যেন কেমন এলো মেলো লাগছে।

মনিরার বুক ফেটে কান্না আসছিলো যখন সে সিড়ির ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছিলো উপরে। মনে পড়েছিলো কয়েক ঘন্টা আগে তারা দু'জন এই সিড়ির ধাপ বেয়ে উপরে উঠে গিয়েছিলো কিন্তু এখন সে কোথায় ---হু হু করে কেঁদে উঠে মনিরা মন।

বার বার আঁচলে অশ্রু মোছে মনিরা। চোখের সম্মুখে ভেসে উঠছে স্বামীকে গ্রেপ্তারের সেই ভয়াবহ দৃশ্যটা।

উভয়ে মনিরার কক্ষে প্রবেশ করলো।

টেবিলে তখনও খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে।

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করেই পুনরায় দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলো। টেবিলে নজর পড়তেই ছটফট করে উঠলো তার হৃদয়ে। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো—মামীমা, একি হলো মামীমা? আমি যে নিজ হাতে ওকে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে এলাম।

কি হয়েছে সব খোলাসা বল্ মনিরা, আমি সব শুনবো।

মামীমা, আমি কেমন করে বলবো আমি কোন্ মুখে বলবো তোমাকে সেই হৃদয়—বিদারক কাহিনী।

মনিরা, আমি ওর মা, আমি বুকে পাষাণ বেঁধেছি। সে অপরাধী, যে কোন মুহূর্তে ওকে গ্রেপ্তার হতে হবে। কেউ তাকে আটকে রাখতে পারবেনা। বল্ বল্ মনিরা, রাজকুমারের বেশেই কি আমার মনির এসেছিলো।

হাঁ মামীমা, কিন্তু কে বলেছে এ কথা?

নকীব, নকীব সব আমাকে বলেছে। মনিরা, আমার মনির কি এসেছিলো?

হাঁ, সেই এসেছিলো রাজকুমারের বেশে--মামীমা, ও বলেছিলে। ফিরে এসে খাবে—বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো মনিরার কণ্ঠস্বর। ধীরে ধীরে টেবিলের পাশে গিয়ে খাবারের ঢাকনা তুলে দেখতে লাগলো। চোখ দিয়ে অশ্রুবিন্দু মুক্তার মত ঝরে পড়তে লাগলো খাবারের থালার উপরে। আবার বললো মনিরা—মামীমা, ফিরে এসে খাবে বলেছিলো কিন্তু ফিরে আর এলোনা। আমি কি জানতাম, আজ ওকে আমি হারাবো---নাহার মঞ্জিল আমাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলো--

নাহার মঞ্জিল!

হাঁ, মামীমা, নাহার মঞ্জিলেই আজ আমরা গিয়েছিলাম, শোন সব তোমাকে বলছি। সেদিন দুপুরে নকীব এসে বললো—আপা মনি, এক সন্ন্যাসী তোমার নূরের সন্ধান জানে বলে বলছে—

সন্ন্যাসী!

হাঁ, সেই সন্ন্যাসী অন্য কেহ নয়—পুলিশ ইন্সপেক্টার আহম্মদ। তিনিই ছদ্মবেশে এসেছিলেন—মনিরা সমস্ত ঘটনা মামীমার নিকট বলে গেলো।

স্তব্ধ নিশ্বাসে সব শুনলেন মরিয়ম বেগম। চিত্রার্পিতের ন্যায় নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটি শব্দও তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

মনিরা সব কথাই বলল। কেমন করে নাহার মঞ্জিলে তারা প্রবেশ করলো কি বলেছিলো তার স্বামী, সব ব্যক্ত করলো মনিরা মামীমার কাছে। আরও বললো—মামীমা—আমিই ওকে বন্দী করলাম।

মরিয়ম বেগম মনিরার পিঠে হাত বুলিয়ে সান্তনার স্বরে বললেন —সবই অদৃষ্ট, নাহলে এতো বড় একটা ঘটনা ঘটবার পূর্বে এতোটুকু আমিও জানতে পারিনি কেনো?

আমিই এজন্য দায়ী মামীমা, আমিই এজন্য দায়ী!

মনিরা আঁচলে চোখ চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগলো।

মরিয়ম বেগম হতাশভাবে বসে পড়লেন খাটের উপরে। চোখের সম্মুখে গোটা পৃথিবীটা যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এলো। পুত্র শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন তিনি। টেবিলে খাবার ঢাকা, পাশে দাঁড়িয়ে আছে মনিরা—পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে। স্বামীর কথাগুলো ভাসছে তার কানের কাছে—তুমি খেয়ে আসতে বলেছিলে, কিন্তু না খেয়ে এসে ভুল করেছি মনিরা বড্ড ক্ষুধা পেয়েছে। --মনিরা খাবারের ঢাকনা খুলে নীরবে তাকিয়ে থাকে খাবারের দিকে। ভাবে, তার অদৃষ্টে নাই স্বামীর পাশে বসে তাকে খাওয়াবে। আনমনা হয়ে যায় মনিরা, স্পষ্ট দেখতে পায় —চেয়ারে বসে আছে তার স্বামী, হাসছে মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে। মনিরা প্লেটখানা এগিয়ে দেয় স্বামীর সম্মুখে। মনিরাও হাসে—খাবার তুলে দেয় প্লেটে—উভয়ের মুখে তাকিয়ে আছে—মনিরা খাবার তুলে স্বামীর মুখে দেয়—হাত থেকে খাবার পড়ে যায় মাটিতে। তাড়াতাড়ি চমকে উঠে, মনিরা, নিজের ভুল বুঝতে পেরে ফিরে তাকায় খাটের দিকে। মামীমা নেই—কখন তিনি উঠে চলে গেছেন। মনিরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, ফিরে তাকায় মুক্ত জানালার দিকে। পূর্ব আকাশ আলোকিত করে প্রভাতের সূর্য উকি দিয়েছে।

মনিরা দুই হাতে মুখ ঢেকে ছোট্ট বালিকার মত কেঁদে উঠে কালকের প্রভাতের কাছে আজকের প্রভাত কত বিষময়—কত বেদনা—দায়ক। কাল প্রভাতে এই মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে নতুন সূর্যের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলো মনিরা—সন্ধ্যায় আসবে সে, মিলত হবে আবার ওরা দু'জনা! আর আজ সব আশা—বাসনা মুছে গেছে নিঃশেষ হয়ে কোন্ অতলে। না জানি এখন তাকে কোথায় কোন কারাগারে বন্দী করে রাখা হয়েছে। খাবার দিয়েছে কি না দিয়েছে তারই বা ঠিক কি আছে।

স্বামীর চিন্তায় মনীরা ভুলে গেলো নিজের ক্ষুধা—তৃষ্ণা সবকিছু। ভোরের আলো নিষ্প্রভ হয়ে এলো তার চোখে।

❑

একটা দুঃস্বপ্নে ঘুম ভেংগে গেলো নূরীর। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসে তাকালো চারিদিকে, পাশে ঘুমন্ত মনি। কক্ষে আর কেউ নেই, নাসরিন আর অন্যান্য সংগিনীরা ঘুমাচ্ছে তখনও। পাশের জানালা দিয়ে ভোরের আলো মেঝেতে ছড়িয়ে পড়েছে।

নূরী শয্যা ত্যাগ করে ছুটে গেলো বনহুরের কক্ষে। প্রবেশ করে দেখতে পেলো—শূন্য বিছানা পড়ে রয়েছে—বনহুর নেই। গত রাতের কথা মনে পড়লো নূরীর, বলেছিলো—সে আজ কোথাও যাবে না, বিশ্রাম করবে গোটা রাত।

কিন্তু কোথায় সে, তবে কি তার স্বপ্ন সত্যি!

ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়, নূরী বসে পড়লো বনহুরের শূন্য বিছানায়। কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলো, জামা কাপড়গুলি যেখানে যেমন তেমনি রয়েছে। মাথার পাগড়ীটাও টেবিলে পড়ে রয়েছে, তবে সে কোথায় গেছে। নূরী তাড়াতাড়ি বালিশ সরিয়ে তীক্ষ্ণ নিক্ষেপ করলো—বালিশের তলায় রিভলভার রাখতো বনহুর, কিন্তু রিভলভারটা নেই তো সেখানে।

নূরী এলোমেলো কত কি চিন্তা করছে, চিন্তা করছে স্বপ্নের কথা। দেখছিলো নূরী অদ্ভুত স্বপ্ন---বনহুর আর সে একটা রথে চেপে আকাশপথে কোথায় যে নো উড়ে যাচ্ছিলো। শুভ্র মেঘের স্তরে স্তরে জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়ছিলো। ফুরফুরে হাওয়া বইছিলো চুলগুলি উড়ছিলো তার পাশে বসে হাসছিলো বনহুর—সুন্দর মধুর সে হাসি।

অপলক নয়নে নূরী উপভোগ করছিলো প্রকৃতির এই মধুময় দৃশ্য।

কত সাগর নদী পেরিয়ে ওদের দু'জনকে নিয়ে রথখানা হাওয়ায় ভেসে চলেছে, কোন অজানার পথে। কত পাহাড় নদী গাছপালা। কত প্রান্তরের উপর দিয়ে তাদের রথ উড়ে চলেছে— বনহুর আর নূরী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

হঠাৎ তারা দেখলো—দূরে মেঘের ফাঁকে একটি সুন্দর কক্ষ।

বললো নূরী—দেখছো হুর, কি সুন্দর ঐ কক্ষটা; কেমন মেঘের উপরে হাওয়ায় ভাসছে। কক্ষটার উপরে জোছনার আলো পড়ে অদ্ভুত এক রঙ এর সৃষ্টি হয়েছে যেন্ ঠিক রামধনুর।

নূরীর দু'চোখ খুশীর উচ্ছাস এমন কক্ষ তো কোনদিন সে দেখেনি। মনের ভিতরে প্রবল বাসনা জাগলো বড় দেখতে ইচ্ছা হলো কক্ষটার মধ্যে। বললো সে—হুর, ওখানে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে?

নূরী লক্ষ্য করলো, তার কথায় বনহুরের মুখ গম্ভীর হয়ে এলো বললো না না, ওখানে যেতে নেই। অতি ভয়ঙ্কর স্থান ওটা ওখানে যেতে নেই।

নূরী ভীষণ জেদ ধরে বসলো—যাবেই সে ওখানে যত বিপদই থাক।

নূরীর জেদে বনহুর রাজি হলো।

রথের সারথীকে বললো বনহুর—ওই কক্ষটার দিকে চলো।

সারথী রথের মোড় ফিরিয়ে নিলো।

নূরীর মনে খুশী আর ধরছে না।

কক্ষের চারিপাশে সোনালী কারু—কার্য খচিত দেয়াল—অপূর্ব এই কক্ষ। নূরীর মনে প্রবল বাসনা দেখবে সে ওর মধ্যে কি আছে।

কক্ষের সম্মুখে এসে তাদের রথ দাঁড়িয়ে পড়লো।

নূরীর হাত ধরে বনহুর এগুতে লাগলো কক্ষটার দিকে।

মেঘের ধাপে ধাপে পা রেখে এগুচ্ছে বনহুর আর নূরীর। মেঘের গায়ে জোছনার আলো ঝকমক করে উঠেছে। রামধনুর মত কত রঙ এর ছ'টা ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

বনহুর আর নূরী প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক কান্ড ঘটে গেলো। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই অসংখ্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটে এসে শরীরে লাগলো বনহুরের আগুন ধরে গেলো তার শরীরে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে লাগলো নূরী চীৎকার করে উঠলো, বাঁচাও --ও ঘুম ভেংগে গেলো নূরীর।

নূরী বনহুরের শূন্য বিছানায় বসে ভোরের স্বপ্নের কথাই চিন্তা করছে, এমন সময় রহমান প্রবেশ করলো সেই কক্ষে, নূরীকে দেখে বললো—সর্দার আসেনি?

নূরী রহমানকে দেখে উঠে দাঁড়ালো, বললো সে—নাতো, বনহুর এখনো ফিরে আসেনি। কিন্তু সে কোথায় গিয়েছিলো বলতে পারো রহমান?

রহমান জানতো বনহুর আজ শহরে যাবে, চৌধুরী বাড়ীতে। কিন্তু ভোরের পূর্বেই তো তার ফিরে আসার কথা ছিলো। দিনের বেলায় শহরে সে কিছুতেই থাকবেনা। তাছাড়া আস্তানায় অনেক কাজ আছে। ফিরে না আসার কারণ কি? নূরীর প্রশ্নে বললো রহমান—সর্দার, কোথায় গেছে আমি তো ঠিক জানি না।

জানো না?

না নূরী।

আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি রহমান, ওর তো কোন বিপদ ঘটেনি?

বিপদ! চমকে উঠে বললো রহমান।

হাঁ, রহমান আমার মন বলছে ওর কোন বিপদ ঘটেছে। তুমি যাও সন্ধান নিয়ে দেখো আজ এতো বেলা হলো তবু এলোনা কেনো।

রহমান চিন্তিত হলো, কিন্তু মুখে বললো—না, ভয় নেই নূরী, সর্দার নিশ্চয়ই এসে পড়বে।

রহমান নূরীর নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলো কিন্তু মনের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তার ঝড় তোলপাড় শুরু করলো। সর্দার তাকে না বলে কোথাও রাত্রি যাপন করেনা আজ সে এমন করে কোথায় ডুব মারলো। ভয় না হলেও আশঙ্কা জাগলো।

তাজ বনহুরকে পথের বাঁকে গাড়ী অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছিলো। একজন অনুচর গিয়েছিলো তাজকে ফিরিয়ে আনার জন্য রহমান তার নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—খালেক, সর্দার কি তোমাকে কিছু বলে গেছেন?

খালেক ঘর্মাক্ত কলেবরে গামছায় হাওয়া খাচ্ছিলো, রহমানকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো বললো—আমি এইমাত্র তাজকে নিয়ে ফিরে এলাম।

তুমি আবার গিয়েছিলে?

হাঁ, আমি সর্দারের আদেশ মত শেষ রাতে আবার গিয়েছিলাম। ভোর পর্যন্ত সর্দারের অপেক্ষা করে ফিরে এলাম এই মাত্র।

সর্দার আসেন নি?

না হুজুর।

তাহলে সর্দার নিজেই ড্রাইভ করে গিয়েছিলেন?

হাঁ, তিনি নিজেই গাড়ী নিয়ে গিয়েছিলেন।

রহমান সোজা চলে গেলো তার ড্রেস পরিবর্তনের কক্ষে।

❑

অসংখ্য পুলিশ পরিবেষ্টিত হয়ে দস্যু বনহুরের পুলিশ ভ্যান হাঙ্গেরিয়া কারাগারের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। আকাশচুম্বী প্রাচীরের ঘেরা হাঙ্গেরিয়া কারাগার। প্রাচীরে উপরিভাগে সুতীক্ষ্ণ ধার লৌহফলক চার আংগুল ফাঁকে ফাঁকে গাঁথা। একটি পাখী পর্যন্ত বসতে পারেনা আজ এই প্রাচীরের উপরে। লৌহ গেট পূর্বের চেয়ে আরও মজবুত আরও দৃঢ় করা হয়েছে।

সেইবার দস্যু বনহুর হাঙ্গেরিয়া কারাগার থেকে পালাবার পর কারাগারটি আরও নতুনভাবে নতুন কৌশলে অতি ভয়ঙ্কর ইস্পাত দ্বারা মজবুত করে নেওয়া হয়েছিলো। আর যেন কোন দস্যু বা ডাকু ঐ ভাবে পালাতে সক্ষম না হয়।

দস্যু বনহুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার করতে পারলে হাঙ্গোরিয়ার কারাগারেই তাকে বন্দী করা হবে এবং সে যেন আর পালাতে সক্ষম না হয়, সেজন্য পূর্ব হতেই হাঙ্গোরিয়া কারাগারে এ সাবধানতা।

বনহুরের সমস্ত শরীরে লৌহ শিকল বাঁধা। হাতে হাতকড়া শুধু পায়ে কোন বন্ধন নেই। চারিদিকে উদ্যত রাইফেল।

বনহুরকে হাঙ্গোরিয়া কারাগারে নিয়ে যাওয়া হলো।

সবচেয়ে বড় এবং ভেনটিলেটার বিহীন একটা কক্ষে দস্যু বনহুরকে আটকে রাখা হলো। লৌহ দরজায় একটি নয় সাতটি মজবুত তালা লাগনো হলো। যে কক্ষে বনহুরকে বন্দী করা হলো সেই কক্ষের চারিপাশে সদা সর্বদা রাইফেলধারী পুলিশ সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত রইলো। লৌহ দরজার পাশে চারজন পুলিশ গুলীভরা রাইফেল নিয়ে দন্ডায়মান।

অদ্ভুত এ দৃশ্য। পাষাণ প্রাচীরে ঘেরা লৌহ কারাগারে বন্দী এক রাজকুমার। দস্যু বনহুরের শরীরে এখনও সেই রাজকীয় ড্রেস, পুলিশ বাহিনীর সাহস হয়নি বনহুরের শরীর থেকে ড্রেস পরিবর্তন করে নিতে। কাজেই এখনও তার দেহে পূর্বের সেই ড্রেস বিরাজ করছে। শুধু মাথায় ক্যাপটা এখন আর নেই। আর নেই তার পেকেটে পিস্তলটা।

লৌহ খাঁচায় আবদ্ধ আজ সিংহ শাবক দস্যু বনহুর।

কারাগারে বন্দী হয়ে বনহুর ভূমি শয্যায় এসে বসলো।

ভোরের আলো তখন কারাগার কক্ষে প্রবেশ করেছে।

বনহুর ভাবতে লাগলো, আজ নাহার মঞ্জিলে সে বন্দী হয়েছে। মনিরাই তাকে নিয়ে এসেছিলো সেখানে, কিন্তু কেনো? তবে কি মনিরা জানতো সব? হঠাৎ এতো জায়গা থাকতে নাহার মঞ্জিল আসার এতো সখ কেনো চেপেছিলো মনিরার? কি যেন বলতে গিয়েও সে বলছিলো না, চেপে যাচ্ছিলো তার কাছে। নিশ্চয়ই মনিরা জানতো, না জানলে সে তাকে নাহার মঞ্জিলে প্রবেশে বাধা দিচ্ছিলো কেনো? মনিরার মুখোভাবও বেশ উত্তোজনাপূর্ণ ছিলো। একটা কেমন যেন ভাব লক্ষ্য করেছিলো বনহুর মনিরার মুখে--- কিন্তু তা কি করে সম্ভব হয়—মনিরা তার সঙ্গে চাতুরী করবে তাকে ধরিয়ে দেবো পুলিশের হাতে! না না, বিশ্বাস হয় না ওকথা, মনিরা স্বামীকে বন্দী করতে পারে না। তাহলে কি এর পিছনে কোন অদৃশ্য ইংগিত রয়েছে।

বনহুর যতই ভাবছে ততই ঘোরালো হয়ে আসছে সমস্ত ঘটনাটা মনিরা শুধু তাকে ভালই বাসেনা সমস্ত অন্তর দিয়ে তাকে কামনা করে। কিছুতেই সে পারে না তাকে পুলিশের কবলে তুলে দিতে। নিশ্চয়ই কোন রহস্য আছে--

বনহুর অধর দংশন করে তাকায় বাইরের দিকে, মনিরাকে পুলিশ বাহিনী তার বাড়ীতে পৌছে দিয়েছে কি না কে জানে। মনিরার মুখখানা কারাগারে বন্দী হয়েও ভুলতে পারে না বনহুর। সত্যিই যদি মনিরা জেনেশুনে নাহার মঞ্জিলে এনে পুলিশের হাতে সঁপে দিয়ে থাকে, তাহলেও বনহুর তাকে ক্ষমা করবে?

বনহুর যখন গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন মিঃ আহম্মদ ও মিঃ জাফরী কারাগারে এলেন বনহুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

বনহুর মৃত্তিকা শয্যায় হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিলো।

মিঃ জাফরী ও মিঃ আহম্মদ এসে দাড়ালেন লৌহ দরজার পাশে। শিকের ফাঁকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন—বনহুর নিশ্চুপ বসে আছে, কিছু চিন্তা করছে সে।

মিঃ আহম্মদ বললেন —কি ভাবছো দস্যু সম্রাট?

বনহুর মুখ তুলে তাকালো, গম্ভীর কণ্ঠে বললো—ভাবছি আমার প্রজাদের কথা।

প্রজা! হাসলেন মিঃ আহম্মদ—রাজ্যের কথা না ভেবে প্রজাদের কথা ভাবছো?

হাঁ ইন্সপেক্টার রাজ্যের কথা ভাববেন আপনারা, আর আমি ভাববো আমার শত শত দুঃস্থ ভাই বোনদের কথা। যাদের চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে কান্দাই এর শুকনো মাটি।

ওঃ খুব তো সাধু বাক্যে আওড়াচ্ছো, কিন্তু মনে রেখো, এবার এই লৌহকক্ষ থেকে তোমার মুক্তি নেই। চালাকি করে আমাকে বন্দী করেছিলে এবার তার পরাভোগ ভোগ করো। কথাগুলি বললেন মিঃ জাফরী।

বনহুর হাসলো, উঠে দাঁড়ালো এবার সে কারাগার মধ্যে। এগিয়ে এলো লৌহশিকের পাশে, বললো—ইন্সপেক্টার আমি চালাকি করে বন্দী করেছিলাম বটে আপনাকে কিন্তু তার পিছনে কোন মন্দ অভিসন্ধি ছিলোনা। দস্যু হলেও আমার উদ্দেশ্য কোনদিন উৎকট নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামই আমার কাজ।

যত ন্যায় কথাই বলো না কেনো, এবার তোমার সাধুগিরির সমাপ্ত হবে।

সে ভয়ে ভীত নয় বনহুর।

তোমাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হবে। বললেন মিঃ আহম্মদ।

হঠাৎ অট্টহাসিতে ভেঙ্গে পড়লো বনহুর—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ মৃত্যুদন্ড?

দস্যু বনহুরের হাসির শব্দ হাঙ্গোরিয়ার কারাগারের পাষাণ প্রাচীরে প্রতিধ্বনি জাগালো।

দস্যু বনহুরের মৃত্যুদণ্ড –১৮

❑

'দস্যু বনহুরের মৃত্যুদণ্ড' কান্দাই পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার বড় বড় অক্ষরে লেখা শব্দটার দিকে তাকিয়ে আছে মনিরা। দণ্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু। অব্যক্ত একটা বেদনা গুমড়ে কেঁদে ফিরছে তার মনের মধ্যে। তুষের আগুনের চেয়েও সে জ্বালা তীব্র দাহময়।

মনিরার জীবন শিশুকাল থেকেই দুঃখ আর ব্যাথায় গড়ে উঠেছে তিল তিল করে। স্নেহ মায়া-মমতার অভাব সে পায়নি কোন দিন, কিন্তু তবু সে বড় অপেয়া। জীবনভর শান্তির ছোয়া কোনো সময় তার জীবনকে সুন্দর ও সুষমামণ্ডিত করতে পারেনি। চন্দ্র গ্রহণের মত কালকুট রাহুগ্রস্ত মনিরা। বসন্তের আহ্বানে বসুন্ধরা যেমন ফুলে ফলে ভরে উঠে, তেমনি প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী মনিরার দেহমনে এসেছে ভাবের আবেগ, যৌবনের কোঠায় পা দিয়েই পেয়েছে নির্মম আঘাত, মায়ের মৃত্যুশোক ভুলতে না ভুলতেই স্নেহময় মামাজানকে হারিয়ে চোখে অন্ধকার দেখছে। হা, ভুলে গিয়েছিলো মনিরা তার শিশুকালের সাথী মনিরকে, বিস্মিত হয়েছিলো তার সব কথা। অতো ছোটবেলায় ছিলোনা কোনো প্রীতির বন্ধন, ছিলোনা হৃদয়ের নিভৃত কোণের কোনো স্পন্দন। মনির হারিয়ে গিয়েছিলো— এতটুকু অনুভূতি জাগেনি কোনো দিন তার মনে।

কালের অতলে তলিয়ে গিয়েছিলো সেদিনের সেই নৌকাডুবির কথা। স্বপ্নের মতও মনে হতো না তার, মনে হতো একটা গল্পে শোনা কাহিনীর মত। তার জীবনে একদিন যে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিলো, ভাবতেও পারতো না মনিরা কোনো সময়।

জীবন জোয়ারে ক্ষুদ্র একটা স্মৃতিকণা কুটার মতই ভেসে গিয়েছিলো কোন্ অজানার অতলে। সেদিন কি মনিরা ভেবেছিলো, আবার একদিন এই ক্ষুদ্র স্মৃতিটুকু তার মনের গহনে প্রচণ্ড আলোড়ন জাগাবে।

সব কথা ছাপিয়ে আজ বারবার মনে পড়ছে— নাহার মঞ্জিলে কেন গিয়েছিলো সে—মনে পড়ছে স্বামীর প্রতিটি কথা। সেতো যেতে চায়নি, মনিরাই তাকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো ঐ অলক্ষুণে প্রেতপুরীতে। যেখানে সে হারিয়েছে তার জীবনের সব আলো। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুলে কাঁদে মনিরা।

নির্বোধ শিশুর মতই অঝোরে কাঁদে মনিরা, কোনো সান্ত্বনাই সে খুঁজে পায় না আজ। অকূল সাগরে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে মনিরা। দিশেহারার

মত ঝাপসা চোখে তাকায় সে আংগুলের ফাঁকে পাশে পড়ে থাকা পত্রিকাখানায়, 'দস্যু বনহুরের মৃত্যুদণ্ড', অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে— না না, এ হতে পারে না, এ হতে পারে না --- ওর মৃত্যুর পূর্বে আমি মৃত্যুবরণ করে নেবো।

মনিরা বালিশে উবু হয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন মরিয়ম বেগম। দরজার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে তাকান কক্ষমধ্যে। মনিরাকে বিছানায় লুটিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে দেখে হৃদয়টা তার যেন চুরমার হয়ে যায়। অতি কষ্টে নিজকে সংযত করে নিয়ে ধীর পদক্ষেপে মনিরার পাশে গিয়ে বসেন, হাত রাখেন তার পিঠে— মা মনিরা!

হঠাৎ মামীমার করস্পর্শে মনিরা তাঁর বুকে মাথা রেখে ডুকরে কেঁদে উঠে—একি হলো মামীমা।

পুত্রের মৃত্যুদণ্ড সংবাদ শ্রবণে কোন্ মা না বিচলিত হয়। কোন্ মার হৃদয়ে না দারুণ আঘাত লাগে। বিশ্বের সবকিছু ত্যাগ করতে পারে কিন্তু কোনো মা কি পারে সন্তানকে ত্যাগ করতে। দস্যু বনহুরের মৃত্যু সংবাদ শোনা অবধি মরিয়ম বেগমের হৃদয়ে তুষের আগুন জ্বলছিলো, চূর্ণ-বিচূর্ণ অন্তর নিয়ে তিনি ছটফট্ করছিলেন। পৃথিবীর কোথাও যেন নেই এতটুকু শান্তির ছোঁয়াচ। যেদিকে তাকাচ্ছিলেন সব যেন গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো। আলো, এতটুকু আলো যেন নেই কোথাও।

ঘরে, বাইরে, খোলা ছাদে একটু শান্তির জন্য বারবার গিয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন মরিয়ম বেগম। কিসের সন্ধানে হাহাকার করে উঠছিলো তাঁর মন। তখনও মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকাচ্ছিলেন সীমাহীন আকাশের দিকে। নেই— কোথাও একটু শান্তি নেই। বুকের মধ্যে তাঁর কান্নার রোল উঠছিলো কিন্তু চোখে পানি আসছিলো না। বুকটা যদি পাথরের তৈরী হতো, তাহলে এতক্ষণ ফেটে চৌচির হয়ে যেতো। লোহা হলেও বুঝি গলে যেতো— এত আগুন সহ্য হতো না।

মরিয়ম বেগম মনিরার কথায় কোনো জবাব দিতে পারলেন না। বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠলো একটা ব্যথার কাঁটা। হৃৎপিন্ডটা যেন হাতুড়ির আঘাতে কেউ থেতলে দিচ্ছিলো কাবাবের মাংসখণ্ডের মত কুচি কুচি করে।

মনিরার কান্নার সঙ্গে যোগ দিয়ে তারও ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিলো, কিন্তু কান্না যে আসছিলো না। জমাট বরফের মত জমে গিয়েছিলো তার বুকের ভিতরটা।

বলে উঠলেন মরিয়ম বেগম—কাঁদিস না মনিরা। দেখছিস্ না, আমি মা হয়ে কেমন পাষাণ হয়ে গেছি! বুকটা আমার পাথরের মত শক্ত হয়ে

উঠেছে। কাঁদতে চাইলেও কান্না বেরোয় না। মনিরা, শুধু আজ নয়— আমি ছাব্বিশটা বছর ধরে ওর জন্য কেঁদেছি। কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেছে আমার ভিতরটা, আর এক ফোঁটা অশ্রু নেই আমার চোখে।

মামীমা, আমি যেন আর পারছি না! ওর মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। সেদিন ওকে আমি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম, আমি জানতাম না নিজের মাথায় নিজে কুঠারাঘাত করতে চলেছি। মামীমা, যেতে চায়নি—ও যেতে চায়নি—

মনিরার চোখের পানিতে সিক্ত হয়ে উঠে মরিয়ম বেগমের বুকের বসন। চোখের অশ্রু নেই, মুখে কথা নেই! পলক পড়ছে কিনা বোঝা যায় না। নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত বসে থাকেন তিনি।

অনেকক্ষণ কেঁদে কেঁদে কিছুটা হাল্কা হয়ে আসে মনিরার বুকের ভিতরটা। আঁচলে চোখ মুছে নিয়ে সোজা হয়ে বসে সে। বলে— মামীমা, ওকে বাঁচানোর কি কোনো উপায় নেই?

আচম্বিতে মরিয়ম বেগম যেন পাল্টে যান, দৃঢ় কণ্ঠে বলেন— না। ওকে বাঁচাতে চাইনে। ওকে মরতে দে...... ওকে মরতে দে......তবু নিশ্চিন্ত হবো। তিল তিল করে যে তুষের আগুন আমার বুকের মধ্যে দাহ করে চলেছে, একবারে সে আগুন নিভে যাবে---- নিভে যাবে----

এ তুমি কি বলছো মামীমা! এ তুমি কি বলছো?

আর সহ্য হয় না। কোন্ অলক্ষুণে মুহূর্তে ওর জন্ম হয়েছিলো। কোন্ অশুভ মুহূর্তে---------

না না, তুমি জানো না মামীমা, অলক্ষুণে সে নয়, অশুভ মুহূর্তেও তার জন্ম হয়নি।

তুই জানিসনে মনিরা, ওর জন্মাবার পর থেকে আমি মনে শান্তি পাইনি। কেন যেন ওর মুখের দিকে তাকালেই মন আমার আনন্দের চেয়ে নিরানন্দে ভরে উঠতো। কেন জানিস? মনে হতো এত সুন্দর জিনিস কোনোদিন থাকবার নয়। ফুল ফোটে-ঝরে যায়। চাঁদ হসে, আবার অন্ধকার আসে। কেন যেন আমার মনে হতো ওকে আমি ধরে রাখতে পারবো না, কখন হারিয়ে ফেলবো-------কখন হারিয়ে যাবে-----যেমন মানিক সিন্দুকে রেখেও মালিক শান্তি পায় না। ঠিক আমার অবস্থাও তেমনি ছিলো --কিছুক্ষণ নিশ্চুপ থেকে বললেন মরিয়ম বেগম শেষ পর্যন্ত আমার আশঙ্কায় পরিণত হলো, হারালাম আমার মাথার মনি— পারলাম না কিছুতেই তারে ধরে রাখতে পারলাম না মরিয়ম বেগমের গণ্ড বেয়ে গড়িয়ে আসে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো— মামীমা, আমিও পারলাম না ওকে ধরে রাখতে------কিন্তু ------আমি বেঁচে থাকবো আর ও চলে যাবে! না না, এ হতে পারে না -------এ হতে পারে না ------মনিরা
কক্ষ থেকে বেরিয়ে পাশের কক্ষে চলে যায়।

❑

ক্ষিপ্তের ন্যায় পায়চারী করে চলেছে রহমান। দক্ষিণ হাতের মুঠায় তার কান্দাই দৈনিক পত্রিকা। মাঝে মাঝে পত্রিকাখানায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অধর দংশন করছে সে। চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা ক্রুদ্ধ হিংস্র ভাব। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে তার ললাটে। ভোরে শিশির বিন্দুর মতই চকচক করছে দরবার-কক্ষের মশালের আলোতে।

একটা পাথরখণ্ডের পাশে দণ্ডায়মান নূরী। আজ তার শরীরে ঘাগড়া আর ওড়না নয়। চুলটাও সাপের মত বিনুনী করে ঝুলে পড়েনি পিঠের উপরে। পুরুষের মত প্যান্ট আর চোস্ত সার্ট, মাথার পাগড়ী, চুলগুলো তারই মধ্যে বেশ করে জড়ানো। মুখভাব গম্ভীর ইস্পাতের মতই শক্ত হয়ে উঠেছে।

দরবার কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য দস্যু। বলিষ্ঠ মজবুত চেহারা, শরীরে জমকালো পোষাক, মাথায় পাগড়ী এবং প্রত্যেকের হাতেই রাইফেল আর বন্দুক। মুখে গালপাট্টা বাঁধা সকলের। এরা দস্যু বনহুরের পাতাল গহ্বরের অনুচর, নিতান্ত প্রয়োজন নাহলে এদের বাইরে বের করা হয় না। এরা যেমন দুর্ধর্ষ, তেমনি ভয়ঙ্কর। এরা মারতেও ভয় করে না, মরতেও না। যেমন সাহসী তেমিন তেজোদীপ্ত এরা। দস্যু বনহুরের অংশগুলি হেলনে এরা উঠে এবং বসে।

রহমান আজ সর্দারের এই বিপদ মুহূর্তে এদের বের না করে পারলো না।

কায়েসও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছে তাদের সর্দারের জন্য। সেও উৎকণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে একপাশে। সকলেরই মুখোভাবে প্রকাশ পাচ্ছে একটা কঠিন ভাব।

থমকে দাঁড়িয়ে বলে উঠে রহমান— ভাইসব, তোমরা জানো আজ আমরা রাজাহারা প্রজা হয়ে পড়েছি। সর্দার আজ পুলিশের কারাকক্ষে বন্দী, শুধু বন্দী নয়—তাকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে। হঠাৎ উন্মাদিনীর ন্যায়

হেসে উঠে নূরী—হাঃ হাঃ হাঃ, হাঃ হাঃ তারপর হাসি থামিয়ে বলে—দস্যু বনহুরের মৃত্যুদণ্ড হাঃ হাঃ হাঃ। দাঁত পিষে বলে আবার নূরী—কার সাধ্য দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। রহমান, তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও, আজ রাতে কান্দাই পুলিশ অফিসে হামলা চালাবো।

রহমান কিছু বলবার পূর্বেই ক্রুদ্ধ অনুচরগণ বজ্রধ্বনি করে উঠে—নূরী রাণী কি জয়! নূরীরাণী কি জয়! আজ আমরা কান্দাই পুলিশ অফিসে হামলা চালাবো।

রহমান গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠে—পুলিশ অফিসে হানা দিয়ে সর্দারকে উদ্ধার করা যাবে না নূরী। এতে রক্তপাত ছাড়া লাভ হবে না কিছু।

নূরী দাঁতে দাঁতে পিষে বলে উঠলো—শুধু পুলিশ অফিস নয় রহমান, সমস্ত শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেবো। আমার হুরকে ওরা হত্যা করবে—এত সাহস ওদের।

নূরী, বিচারে সর্দারকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে, এর জন্য দায়ী নয় পুলিশ বাহিনী বা কান্দাইয়ের জনগণ।

তবে কে দায়ী?

দায়ী আইন। পুলিশ আইনের দাস, তারা তাদের কর্তব্য পালন করেছে।

রহমান!

নূরী, তুমি যেভাবে উত্তেজিত হচ্ছো তাতে ফল হবে না, খুব চিন্তা করে কাজ করতে হবে।

তবে কি করতে চাও রহমান? এতগুলো অনুচর থাকতে তোমরা সর্দারের মৃত্যু দেখতে চাও?

উপায় কি?

এবার নূরী ক্ষিপ্তের ন্যায় চীৎকার করে উঠে—রহমান, তুমি সর্দারের মৃত্যু কামনা করো! একে বন্দী করো কায়েস।

রহমান এবার হেসে উঠলো—নূরী, তুমি উন্মাদ হয়ে পড়েছো।

না, আমি উন্মাদ হইনি।

তাহলে তুমি এতক্ষণে আমাকে বন্দী করবার জন্য কয়েসকে নির্দেশ দিতে না।

তুমি বিশ্বাসঘাতক।

নূরী, জবান সংযত করে কথা বলো। নারী বলে তোমাকে ক্ষমা করলাম। অন্য কেউ হলে এতক্ষণ তার বুকের রক্তে দরবার কক্ষের মেঝে লালে লাল হয়ে উঠতো। যাক, শোন, বাজে চিন্তা করবার সময় নেই, আগামী সপ্তাহের প্রথম দিন সর্দারকে জম্বুর কারাকক্ষের গুপ্তস্থানে গুলীবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে।

উঃ এত বড় কথা বলতে পারলে রহমান।

যা ঘটতে যাচ্ছে তা বলতে পারবো না? শোন নূরী, তুমি দস্যুকন্যা এতে সহজে মুষড়ে পড়লে চলবে না। সর্দারকে রক্ষা করবার উপায় খুঁজতে হবে।

প্রাণ দিয়েও আমি তোমাকে সাহায্য করবো রহমান।

হাঁ, তাই চাই। সর্দারকে হাঙ্গেরী কারাকক্ষে এখন বন্দী করে রাখা হয়েছে।

সেখান থেকে একবার হুর পালাতে সক্ষম হয়েছিলো!

হাঁ নূরী, কিন্তু এবার তাকে পূর্বের মত রাখা হয়নি। লৌহ পাত দিয়ে তৈরী সেই কক্ষ। শুধু তাই নয়, লৌহ কারাকক্ষের চারপাশে সদাসর্বদা রাইফেলধারী পাহারাদার দণ্ডায়মান। এক জন দু'জন নয়, শত শত পুলিশ ফোর্স সমর প্রাঙ্গণের সৈনিকের মতই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে যেন বিপক্ষ বাহিনী তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এইভাবে তারা প্রস্তুত হয়ে আছে।

তাই বলো, না হলে কি কেউ সিংহশাককে বন্দী করে রাখতে পারে। আমার হুর তাহলে ......তাহলে মুক্তি পাবে না।

শোন নূরী।

বলো?

আগামী সপ্তাহে প্রথম দিন বেলা দু'টায় প্রকাশ্য কান্দাইর রাজপথ দিয়ে শত শত পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত হয়ে সর্দারকে নিয়ে যাওয়া হবে জম্বুর কারাকক্ষে। ওখানে একটা গুপ্তকক্ষ আছে, সেই কক্ষে তাকে হত্যা করা হবে গুলীবিদ্ধ করে। কিন্তু যখন তাকে পুলিশ ভ্যানে শত শত পুলিশফোর্স বেষ্টিত করে কান্দাই থেকে চব্বিশ মাইল দূরে জম্বুর কারাকক্ষে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন একটি মাত্র সুযোগ তাকে উদ্ধার করবার।

হঠাৎ নূরীর চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো, খুশীভরা গলায় বলে উঠলো সে ঐ মুহূর্তে আমার মনে হয় পালাতে সক্ষম হবে রহমান? আমার হুর পালাতে সক্ষম হবে .....

নূরীর কথায় রহমান কিছুমাত্র খুশী না হয়ে বললো— যা ভাবছো তা অসম্ভব নূরী। সর্দারের সমস্ত শরীর থাকবে লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ। হাতে থাকবে লৌহ হাতকড়া, কোমরে গলায় পিঠে — সমস্ত দেহটা জড়ানো থাকবে লৌহ শিকলে কি উপায়ে সে পুলিশ ফোর্সকে পরাজিত করে পালাতে সক্ষম হবে, বলো? একটু থেমে বললো রহমান— হাঙ্গেরী কারাগার হতে যখন কান্দাই রাজপথ দিয়ে পুলিশ ভ্যানগুলো জম্বু অভিমুখে রওয়ানা দেবে—ঠিক সেই

মুহূর্তে আক্রমণ চালাতে হবে আমাদের। রক্ত ক্ষয় হবে প্রচুর, কিন্তু যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে সর্দারকে।

আমিও তোমাদের সহায়তা করবো রহমান।

কিন্তু তুমি যে,---------

আমি নারী তাই ভয় পাচ্ছো? কিন্তু জানো না—আমি যেমন কোমল হৃদয়, তেমনি ভয়ঙ্করী --- নূরীর দু'চোখে যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে।

রহমান স্তব্ধ নিশ্বাসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো নূরীর মুখের দিকে, তারপর বললো—বেশ তাই হবে। এবার ফিরে তাকালো। সে অনুচরগণের মুখে—ভাই, আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা এখন সম্মুখে। প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে সর্দারকে উদ্ধার করতে হবে।

সমস্বরে বলে উঠে অনুচরগণ .... আমরা সর্দারের জন্য প্রাণ দেবো। আমরা সর্দারকে উদ্ধার করবো। আমরা শপথ করছি।

শত শত অনুচর কণ্ঠের বজ্রধ্বনিতে প্রকম্পিত হয়ে উঠলো দস্যু বনহুরের দরবারকক্ষ।

রহমান তার দক্ষিণ হাতখানা ঊর্ধ্বে তুলে ধরে মুষ্টিবদ্ধভাবে বলে উঠে সাবাস! সাবাস ভাই!

সমস্ত দস্যুগণের চোখে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়।

মশালের আলোতে চক্ চক্ করে উঠে তাদের চোখগুলো। বলিষ্ঠ দেহের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠে ইস্পাতের মত। মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠে তাদের। সর্দারের মুক্তি কামনায় সবাই আজ বদ্ধপরিকর।

তখনকার মত দরবারকক্ষ ত্যাগ করবার জন্য আদেশ দেয় রহমান অনুচরগণকে।

সবাই কুর্ণিশ জানিয়ে বিদায় গ্রহণ করে।

রহমান এবার পত্রিকাখানা মেলে ধরে টেবিলে।

নূরী ঝুঁকে পড়ে বলে রহমান, কবে সেই দিন?

আগামী মঙ্গল বার—আজ থেকে আটদিন পর।

আজও বুঝি ঐ দিন?

হাঁ, আজ ঐ দিন, মঙ্গলবার। নূরী আমাকে এক্ষুনি একটু বাইরে বের হতে হবে চলো।

দরবারকক্ষ হতে বাইরে বেরিয়ে আসে রহমান আর নূরী।

দস্যু বনহুরের দরবারকক্ষ হতে বাইরে বেরিয়ে আসতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেলো কেউ বুঝতে পারবে না—সেখানে কোনো দরজা বা কোনো গর্ত আছে। একটা পাথরের বিরাট চাপ ছাড়া কিছু মনে হবে না।

দস্যু বনহুর যখন ঐ দরবারকক্ষে তার অনুচরদের নিয়ে আলাপ আলোচনায় রত থাকে, তখন দরজা এমনভাবে বন্ধ থাকে—বাইরে থেকে কেউ বুঝতে পারবেনা এটা পাথরখন্ড নয়; কোনো দরজা বা কোনো কক্ষে প্রবেশপথ। দরবারকক্ষের কোনো কথাবার্তা বাইরে থেকে শোনবার উপায় নেই। এতটুকু শব্দও বাইরে আসে না।

পাথরখন্ডের দুই পাশে দু'জন রাইফেলধারী দস্যু অনুচর সাদাসর্বদা পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে।

রহমান আর নূরী বাইরে আসতেই রাইফেলধারী পাহারাদ্বয় কুর্নিশ জানালো। সর্দারের অনুপস্থিতিতে রহমানকে তারা সর্দারের মতই সমীহ করে। সে যেভাবে তাদের পরিচালনা করে সেইভাবেই কাজ করে তারা। তার কথায় উঠে-বসে।

নূরী চলে গেলো তার নিজ কক্ষের দিকে।

রহমান এগিয়ে চললো সম্মুখে। তার ড্রেস পরিবর্তন কক্ষে প্রবেশ করলো।

যখন সে ড্রেস পরিবর্তন কক্ষ থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তাকে ঠিক একজন ট্রাক্সি ড্রাইভার বলে মনে হচ্ছিলো। পিস্তলটা পকেটে রেখে নূরীর পাশে এসে দাঁড়ালো।

হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক মনে করে নূরী কঠিন কণ্ঠে বললো—কে তুমি? কেন এখানে এলে?

অন্যদিন হলে রহমান কিছুটা ঠাট্টা করতে ছাড়তো না, কিন্তু আজ তার মন অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পূর্ণ। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললো—নূরী আমি শহরে যাচ্ছি।

রহমানের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরে আশ্বস্ত হলো নূরী। বললো এবার সে—শহরে যাচ্ছো?

হাঁ।

দুল্‌কীকে নিয়ে যাবে না?

না, সেই কারণেই তো এই ড্রেস।

ফিরবে কখন রহমান?

কবে ফিরবো, কখন ফিরবো জানি না। না—ও ফিরতে পারি।

এসব তুমি কি বলছো রহমান?

হাঁ নূরী, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহমদের গাড়ীর ড্রাইভার আজ থেকে রহমান—বুঝলে?

পুলিশ ইন্সেপেক্টার আহম্মদ

হাঁ, যে আমাদের সর্দারকে বন্দী করেছে।

তুমি তুমি ---

আমি তারই গাড়ীর ড্রাইভার হয়ে সব সংবাদ সংগ্রহ করবো। তারপর ---তারপর --থেমে যায় রহমান।

নূরী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

রহমান পকেটে হাত রেখে পিস্তলটার অস্তিত্ব অনুভব করে নিয়ে পা বাড়ালো সামনের দিকে।

নূরী অস্ফুট কণ্ঠে বললো—খোদা হাফেজ!

❑

মিঃ আহমদ ও মিঃ জাফরী গাড়ীর পাশে এসে দাঁড়ালেন। ড্রাইভার গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ আহমদ গাড়ীতে উঠে বসে মিঃ জাফরীকে বললেন—আপনিও আসুন আমার গাড়ীতে, আপনার বাসায় পৌঁছে দিয়ে যাবো।

মিঃ জাফরী বললেন—আমার গাড়ী এতক্ষণও এলো না কেন বুঝতে পারছিনে।

হয়তো গাড়ীর কোনো অসুখ ঘটেছে। বললেন মিঃ আহমদ।

মিঃ আহমদের হ্যস্যপূর্ণ কথায় মিঃ জাফরী হেসে গাড়িতে উঠে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয় সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন।

এক মুখ ধোয়া উদগীরণ করে বললেন মিঃ আহমদ —মিঃ জাফরী আমি কল্পনাও করতে পারিনি এত সহজে দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হবো।

আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি কৌশলের জন্যই গভর্ণর খুশী হয়ে আপনাকে নতুন নামে ভূষিত করেছেন এবং লক্ষ টাকা পুরস্কার দিয়েছেন। দস্যু বনহুরকে আজও কেউ বন্দী করতে সক্ষম হয়নি।

বন্দী তো দূরের কথা তার দর্শন লাভই সম্ভব ছিলো না।

এবার শুধু বন্দীই নয় মিঃ আহমদ, আপনার অক্লান্ত চেষ্টায় দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা সম্ভব হলো।

ড্রাইভারের হাতখানা মুষ্টিবদ্ধ হলো নিজের অজ্ঞাতে দাঁতে দাঁত পিষে আপন মনে বললো—সর্দারকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করা দুনিয়ার কারও পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ না পরওয়ার দেগার তার আয়ু শেষ না করে--

ড্রাইভারকে বিড়বিড় করে কিছু বলতে শুনে বললেন মিঃ আহমদ—ড্রাইভার?

জ্বী, বড় শীত লাগছে, দাঁত ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে আমার।

শীতে দাঁত কাঁপলেও কাজ শেষ না করে উপায় নেই। চলো মিঃ জাফরীকে তার বাংলোয় পৌঁছে দিয়ে যেতে হবে।

ড্রাইভার মিঃ জাফরীর বাংলো অভিমুখে গাড়ী চালিয়ে চললো। দৃষ্টি তার গাড়ীর সম্মুখে সীমাবদ্ধ থাকলেও কান ছিলো পিছনে। পুলিশ ইন্সপেক্টার দ্বয়ের কথোপকথন শুনছিলো সে মনোযোগ সহকারে।

মিঃ জাফরী এক সময় বলে উঠলেন—মিঃ আহমদ, দস্যু বনহুরকে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে জম্বুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া ঠিক হচ্ছে?

কেন?

আমার মনে হয় তাকে হাঙ্গেরী কারাগারেই হত্যা করা সমীচীন হবে।

কিন্তু আইনে তাকে যেভাবে হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে জম্বুর কারাকক্ষ ছাড়া উপায় নেই। ত্রিফলার সঙ্গে তার হাত দু'খানা, আর পা নীচে ফলার সঙ্গে বাঁধা থাকবে, চক্রাকারে এই ত্রিফলা ঘুরতে থাকবে, সেই অবস্থায় তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে। কারণ, তার মত দুর্ধর্ষ দস্যুর মৃত্যু আর কোনো উপায়ে দেওয়া যায় না।

এইবার শয়তানকে উচিত সাজা দেওয়া হবে।

শুধু উচিত নয় মিঃ জাফরী। ত্রিফলা যখন চক্রাকারে ঘুরতে থাকবে তখন দূর থেকে তার হাতে পায়ে শরীরের বিভিন্ন অংশে গুলী ছোড়া হবে।

যতক্ষণ না দস্যুর মৃত্যু ঘটেছে ততক্ষণ আমি যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিনে মিঃ আহমদ।

হো হো করে হেসে উঠলেন মিঃ আহমদ—কেন বলুন তো?

মিঃ জাফরী বললেন—দস্যু বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই।

মিঃ আহমদ এবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—অগণিত পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত হয়ে দস্যু বনহুরকে নিয়ে যাওয়া হবে জম্বুর কারাকক্ষে। তার হাত—পা সব থাকবে লৌহশিকলে আবদ্ধ এসব তো আপনি শুনেছেন—তবু আশঙ্কা?

নানা কথাবার্তার মধ্যে মিঃ জাফরীর বাংলোর সামনে এসে গাড়ী থামলো।

সেদিনের মত বিদায় নিয়ে নেমে পড়লেন মিঃ জাফরী।

মিঃ আহমদ বললেন ড্রাইভারকে লক্ষ্য করে —বাসায় চলো।

রহমানের পরিচিত এসব পথ। এ শহরের কার বাসা কোথায়, সব তার নখদর্পণে, কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না।

মিঃ আহমদকে বাসায় পৌছে দিয়ে ড্রাইভার বেশী রহমান ছুটি পেলো।

রাতেও তার বিশ্রাম নেই।

রহমান এবার চললো চৌধুরী বাড়ীর দিকে। বেশ কয়েক দিন হলো বৌরাণীর সন্ধান সে নিতে পারেনি। সর্দারের মৃত্যুদন্ড সংবাদে নিশ্চয়ই বৌরাণী পাগলিনী প্রায় হয়ে পড়েছে। তাকে সান্ত্বনা দেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

কিন্তু এত রাতে চৌধুরী বাড়ীতে গিয়ে বৌরাণীর সঙ্গে দেখা করা কি সম্ভব হবে? দেখা না করলেও তো নয়। যেমন করে হোক উপায় খুঁজে নিতে হবে তাকে।

রহমান বাস্‌যোগে তাদের শহরের আস্তানায় ফিরে এলো, নিজের গাড়ী নিয়ে রওয়ানা দিলো চৌধুরী বাড়ীর দিকে।

কান্দাই শহর, মস্ত বড় শহর—শহরের প্রায় এক প্রান্তে চৌধুরীবাড়ী।

রহমান যখন চৌধুরী বাড়ী গিয়ে পৌঁছলো তখন অবাক হলো —বাড়ীর সবাই যেন বেশ উৎকুন্ঠার সঙ্গে চলাফেরা করছে। বৈঠকখানা কক্ষে সরকার সাহেব আরও কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন।

এত রাতে চৌধুরীবাড়ীতে সবাই জেগে, ব্যাপার কি?

রহমান দূর থেকে লক্ষ্য করছে, এগুবো কিনা ভাবছে সে। এমন সময় গাড়ী বারান্দার সিড়ি বেয়ে নেমে এলেন সরকার

সাহেব এবং আর একজন ভদ্রলোক। ভাল করে লক্ষ্য করতেই চমকে উঠলো রহমান। দেখতে পেলো—ভদ্রলোকটার গলায় স্ট্যাথিসকোপ ঝুলছে নিশ্চয়ই কোনো ডাক্তার—কিন্তু এত রাতে ডাক্তার কেন?

রহমান আতঙ্কিত হলো, তাহলে কি বৌরাণীর কোনো অসুখ! নিজকে ধরে রাখতে পারলো না সে—এগুলো সম্মুখের দিকে। একটা ফুলঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে কান পাতলো রহমান। ঐ শোনা যাচ্ছে তাদের কথাগুলো, সরকার সাহেব বলছেন—ডাক্তার সাহেব মনিরা বাঁচবে তো?

ডাক্তার একটু চিন্তা করে বললেন—ওর পেটে আর বিষ নেই। সব আমি যন্ত্র দ্বারা বের করে নিতে সক্ষম হয়েছি; তবে এখনও আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নই।

রহমানের কানে যেন কে গরম সীসা ঢেলে দিলো, বৌরাণী তাহলে বিষ পান করেছে। সর্দারের মৃত্যুদন্ডাদেশ জানতে পেরে সে এই কাজ করেছে।

ডাক্তার গাড়ীতে উঠে বসলেন।

রহমান ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়লো।

একটা গাছের নীচে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো রহমান—সর্দার নেই কার কাছে গিয়ে বলবে বৌরাণী বিষ খেয়েছে, এখন কি উপায়ে

তাকে বাঁচানো যায়। সর্দারের উপস্থিতকালে এ ঘটনা ঘটলে তাকে এত ভাবতে হতো না। কিন্তু যেমন করে হোক বৌরাণীকে বাঁচাতেই হবে। হঠাৎ মনে পড়লো আস্তানায় একটা ওষুধ আছে সেই ওষুধ পান করালে যত বিষাক্ত জিনিসই ভক্ষণ করুক না কেন, অল্পক্ষণের মধ্যেই আরোগ্য লাভ করে। রহমান আর বিলম্ব না করে দ্রুত উঠে দাঁড়ালো, কিছুদূরে তার গাড়ী অপেক্ষা করছিলো। ফিরে গেলো গাড়ীর পাশে।

দ্রুত হস্তে গাড়ীর দরজা খুলে ড্রাইভ আসনে উঠে বসলো রহমান। গাড়ী এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো।

এ পথ, সে পথ করে যে পথ এগুলে শীঘ্র হবে সেই পথে গাড়ী চালিয়ে চললো।

রাত বেড়ে যাওয়ায় পথে প্রায় জনহীন, কোনো অসুবিধা হলো না রহমানের।

জঙ্গলের নিকট যেখানে তার অশ্ব দুলকীবাঁধা ছিলো সেই খানে পৌঁছে আশ্বস্ত হলো, কায়েস দুলকী রেখেছে ঠিক তার কথামতই। রহমান তাকে বলেছিলো হঠাৎ কখন না কখন আস্তানায় দরকার পড়ে—কাজেই সব সময় দুলকীকে যেন পথের বাঁকে তাদের সেই গোপন জঙ্গলে বেঁধে রাখা হয়।

রহমান এবার দুলকীর পিঠে চেপে বসলো।

দুলকী তার মনিবের কথা যেন বুঝতে পারলো। ঠিক তাদের আস্তানার পথ ধরে দ্রুত ছুটে চললো। যেমন করেই হোক এই রাতেই তাকে আবার শহরে ফিরতে হবে। আবার তাকে যেতে হবে চৌধুরী বাড়ী না হলে বৌরাণীকে বাঁচানো যাবে না।

ঝোপ-ঝাড়-জংঙ্গল ডিঙ্গিয়ে ছুটে চলেছে দুলকী। রহমানের শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। এখনও তার দেহে ড্রাইভারের ড্রেস।

পূর্বের সেই আস্তানা এখন আর নেই। এখন দস্যু বনহুর মাটির নীচে কৌশলে তার আস্তানা তৈরী করেছে। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এ আস্তানা তৈরী করতে। পুলিশের সাধ্য নেই। এই আস্তানার সন্ধান পায়।

রহমান যখন আস্তানায় পৌছলো তখন রাতের শেষ ভাগ। দুল্‌কী থেকে নেমে সুড়ঙ্গপথে অগ্রসর হলো সে। বনহুরের কক্ষের একটা শিশিতে ঐ ওষুধ ছিলো।

রহমান বনহুরের কক্ষ থেকে ওষুধের শিশি নিয়ে যখন বের হতে যাবে, অমনি নূরী এসে দাঁড়ালো তার সম্মুখে—রহমান তুমি।

রহমান এত দ্রুত বের হতে যাচ্ছিলো, শুধু একটা শব্দ করলো—হাঁ।

কখন এলে? কোথায় যাচ্ছো আবার?

এখন সময় নেই বলবার ফিরে এসে বলবো নূরী।

নূরী কিছু বলবার পূর্বেই রহমান ছুটে বেরিয়ে যায়।

শুনতে পায় নূরী সুড়ঙ্গ পথে দ্রুত অশ্বপদ শব্দ। বুঝতে পারে রহমান চলে গেলো।

নূরীর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে যায়। এত রাতে রহমান কেনই বা এসেছিলো, আবার এমনভাবে কেনইবা চলে গেলো। কি যেন গোপনে নিয়ে গেলো সে। কি নিয়ে গেলো—বনহুরের কক্ষ থেকেই সে কিছু নিয়ে গেলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কি নিয়ে গেলো সে?

নূরী যখন এসব চিন্তায় ব্যস্ত তখন রহমান দুলকীর পিঠে বন জঙ্গল ভেঙ্গে ছুটছে। কোনো দিকে তার খেয়াল নেই। রাত ভোর হবার আগেই তাকে চৌধুরী বাড়ীতে পৌছতে হবে।

অশ্ব চালনায় রহমান বনহুরের সমকক্ষই ছিলো। তীরবেগে ছুটে চললো দুলকীর পিঠে রহমান।

চৌধুরী বাড়ীর পেছনে এসে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো রহমান। দুলকীকে একটা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে পিছন পাইপ বেয়ে দ্রুত উঠে গেলো উপরে যে পথে বনহুর মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে থাকে।

রহমান মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো—বিছানায় শায়িত মনিরা, শিয়রে একটা চেয়ার ঠেস দিয়ে চোখ বুঁজে আছে বৃদ্ধা মরিয়ম বেগম তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি।

রহমান পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বের করলো পাশের টেবিলেই ছিলো ওষুধ খাওয়ানোর গেলাস—ঐ গেলাসে শিশি থেকে ওষুধ ঢেলে মনিরার মুখের কাছে নিয়ে গেলো। চারিদিকে তাকিয়ে একবার দেখে নিলো রহমান।

মনিরার ঠোঁটের ফাঁকে ওষুধটুকু ঢেলে দিলো সে অতি সন্তর্পণে। ঠিক সেই মুহূর্তে আজান ধ্বনি ভেসে এলো দূর কোনো মসজিদ থেকে।

রহমান সোজা হয়ে দাঁড়াবার পূর্বেই জেগে গেলেন মরিয়ম বেগম, চোখ মেলে তাকিয়েই অজানা—অচেনা একটা লোককে কক্ষে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চিৎকার করে উঠলেন তিনি —কে--কে--

রহমান যেমনি জানালা দিয়ে পালাতে যাবে অমনি সরকার সাহেব রিভলবার হাতে মেঝেতে এসে দাঁড়ালেন—খবরদার, পালাতে চেষ্টা করলেই মরবে।

রহমান অগত্যা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ফিরে তাকালো সে সরকার সাহেবের দিকে। রহমানকে সরকার সাহেব জানতেন, কারণ অনেক দিন সে এ বাড়ীতে এসেছে নানা ছদ্মবেশে। আজ রহমানের শরীরে ড্রাইভারের ড্রেস এখনও বিদ্যমান।

সরকার সাহেব রহমানকে চিনতে পারলেন না। তিনি এগিয়ে গিয়ে রিভলবার চেপে ধরলেন তার বুকে। গম্ভীর কঠিন কণ্ঠে বললেন কে তুমি? কি কারণে এখানে এসেছিলে?

রহমান তার মুখ থেকে ছাট করা দাঁড়ি আর গোঁফ খুলে ফেললো—

সরকার সাহেব বলে উঠলেন—আপনি!

সরকার সাহেব রহমানকে চিনলেও মরিয়ম বেগম তাকে দেখেননি কোনো দিন, তিনি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন—কে এই বলিষ্ঠ যুবক, কি এর নাম, কেনই বা এখানে এসেছিলো আর সরকার সাহেবই বা তাকে চিনলেন কি করে।

মরিয়ম বেগম যখন অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন সরকার সাহেব আর রহমানের দিকে, তখন রহমান বললো—মা, আমিও আপনার একজন হতভাগ্য সন্তান। আপনার পুত্র দস্যু বনহুর আমাদের সর্দার---

তুমি তুমি আমার মনিরের অনুচর সঙ্গী?

হাঁ, আমি বৌরাণীর বিষপানের কথা জানতে পেরেছি এবং সেই কারণেই এখানে এসেছি। আমাদের আস্তানায় এমন একটা ওষুধ ছিলো—যে ওষুধ পান করলে সব রকম বিষক্রিয়া বিনষ্ট হয়ে যায়।

কই, কোথায় সে ওষুধ? বললেন সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম আগ্রহভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন—এনেছো? এনেছো তুমি সেই ঔষুধ?

হাঁ মা, এনেছিলাম। বৌরাণীকে খাইয়ে দিয়েছি।

আনন্দভরা গলায় বলে উঠেন মরিয়ম বেগম—সত্যি তুমি আমার মনিরাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছো? এবার আমার মনিরা বেঁচে উঠবে?

যদি আয়ু থাকে তবে নিশ্চয়ই বেঁচে উঠবে। ওষুধ আমি তাকেই খাইয়ে দিয়েছি।

সরকার সাহেব আর রহমান মনিরার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সরকার সাহেব হাতের রিভলবারটা রাখলেন টেবিলে।

রহমান বললো—প্রকাশ্যে আসার সুযোগ করে উঠতে পারিনি। তাছাড়া আপনারা যদি এ ওষুধ বৌরাণীকে পান করতে না দেন, সেই জন্যই আমি গোপনে তাকে ওষুধ খাইয়ে দিয়েছি।

সরকার সাহেব রহমানের হাত মুঠায় চেপে ধরলেন—আমি ভুল করে আপনাকে----

না না, তাতে কি, আপনি তো জানতেন না আমি কে, আর কি উদ্দেশ্যেই বা এসেছিলাম।

হাঁ, জানতামনা বলেই এমন একটা অঘটন ঘটাতে যাচ্ছিলাম--

সরকার সাহেবের কথা শেষ হয় না, মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠে পানি---একটু পানি-- দাও--

মুহূর্তে মরিয়ম বেগম এবং সরকার সাহেবের মুখ খুশীতেই দীপ্ত হয়ে উঠে।

রহমানের চোখে মুখেও আনন্দের দ্যুতি খেলে যায়।

একসঙ্গে সবাই ঝুঁকে পড়ে মনিরার মুখের উপর।

রহমানের পাশের ঢাকা দেওয়া পানির গেলাসটা তুলে দেয় মরিয়ম বেগমের হাতে।

মরিয়ম বেগম একটু পানি ঢেলে দেন মনিরার ঠোঁটের ফাঁকে।

ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে সবাই তাকিয়ে আছে মনিরার মলিন মুখের দিকে।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালো মনিরা।

মরিয়ম বেগম উদগ্রীব কণ্ঠে ডাকলেন—মা মনিরা!

মনিরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠলো—এত অন্ধকার কেন? এত অন্ধকার কেন?

কই, কোথায় অন্ধকার মা?

সরকার সাহেব ওদিকের জানালটা খুলে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রৌদ্র এসে লুটিয়ে পড়লো মনিরার বিছানায়।

রহমান বললো এবার—বৌরাণী।

রহমানের কণ্ঠস্বরে মনিরা ফিরে তাকালো। কিন্তু মনিরা তাকে দেখতে পেলো না। বিষপানে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আবার বলে উঠলো কে কে তুমি? আমি কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে, দেখতে পাচ্ছিনে---

বৌরাণী, বৌরাণী আমি রহমান।

রহমান, রহমান তুমি এসেছো? কিন্তু আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে--- উঠে বসতে যায় মনিরা।

মরিয়ম বেগম মনিরাকে ধরে শুইয়ে দিয়ে বলে উঠেন সরকার সাহেব, একি হলো একি হলো আমাদের।

সরকার সাহেবের গন্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো, বললেন তিনি বেগম সাহেবা, ডাক্তার বলেছিলেন, যে বিষ মনিরা পান করেছে যদি বেঁচে থাকে তবে সে আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে না।

অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম—সরকার সাহেব।

রহমানের দু'চোখ ডিমের মত গোলাকার হয়ে উঠলো—একি অঘটন ঘটে গেলো বৌরাণীর।

মনিরা এতক্ষণে বুঝতে পারলো কি হয়েছে তার। মনে পড়লো ধীরে ধীরে সব কথা—সে তো বিষ পান করেছিলো; তবু এখনও বেঁচে আছে। যে বিষ সে পান করেছে, বাঁচবারতো কথা না। মনিরা হঠাৎ চীৎকার করে উঠলো—আমি মরতে চাই। আমি মরতে চাই। এ জীবন নিয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারবো না—না না না।

একি পাগলামি করছো মা মনিরা? বললেন সরকার সাহেব।

মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

রহমান বললো—বৌরাণী, আপনি এত অবুঝ জানতাম না। আপনি বিষ পান করলেন কেন? কেন আপনি এ ভুল করলেন বৌরাণী?

রহমান, এ জীবন নিয়ে বেঁচে থেকে কি হবে বলো? যার জন্য বেঁচে থাকবো সেই যদি চলে যায়। না না, আমাকে তোমরা মেরে ফেলো। মেরে ফেলো রহমান, ওর মৃত্যু সংবাদ যেন শুনতে না হয়।

বৌরাণী, আমাদের দেহে প্রাণ থাকতে আমাদের সর্দারের মৃত্যু হবে—এ কথা আপনি চিন্তা করতে পারলেন। দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদন্ড দেয় এমন সাধ্য কারও নেই---

রহমান!

হাঁ বৌরাণী, সর্দারকে আমরা উদ্ধার করবোই করবো। আমাদের জীবন দিয়েও তাকে আমরা ফিরিয়ে আনবো। কিন্তু বৌরাণী এ আপনি কি করলেন, আপনি কেন এ ভুল করলেন।

মরিয়ম বেগম নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিলেন।

সরকার সাহেব দাঁড়িয়েছিলেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বের হচ্ছিলো না।

রহমান বললো—আমি আর বিলম্ব করতে পারছিনে। অনেক কাজ আছে।

মনিরা বলে উঠলো—চলে যাচ্ছো রহমান?

হাঁ বৌরাণী, আবার আসবো।

সরকার সাহেব বললেন—মনিরা, রহমানই তোমাকে এই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনলো। তার ওষুধই তোমাকে এখনও জীবিত রেখেছে।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো মনিরা রহমান।

আসি বৌরাণী, খোদা হাফেজ।

খোদা হাফেজ! বললো মনিরা।

মনিরার অবস্থা একটু আরোগ্যের দিকে কিন্তু সে এখন আর দেখতে পায় না। দুনিয়ার সমস্ত আলো তার চোখে অন্ধকার। শহরের বড় বড় ডাক্তার বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন একবাক্যে সবাই বললেন বিষাক্ত ওষুধ পানে তার দৃষ্টি শক্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। আর কোনো দিন সে দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবে না।

এই বিপদ মুহূর্তে মরিয়ম বেগম নিজেও চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। কেঁদে কেটে আকুল হলেন তিনি। বিপদের উপর বিপদ—একে পুত্রশোকে কাতর তার উপর মনিরার চোখ দুটো চির দিনের জন্য অন্ধ হয়ে গেলো। তিনি যেন অকুল সাগরে হাবুডুবু খেতে লাগলেন।

সুযোগ পেলেই আসে রহমান, নানারকম প্রবোধ বাক্যে মনিরা ও মরিয়ম বেগমকে সান্ত্বনা দেয় সে।

মনিরা নিজের দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও দুঃখিত নয়, তার সদা—সর্বদা চিন্তা স্বামীর জন্য। রহমানকে বলে মনিরা—কেন আমি বেঁচে রইলাম? কেন আমাকে মরতে দিলে না রহমান? দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও আমার দুঃখ নেই কেমন করে সহ্য করবো ওর মৃত্যু সংবাদ?

বৌরাণী, সর্দারের মৃত্যুসংবাদ আপনাকে শুনতে হবে না। দৃঢ় কণ্ঠে বললো রহমান।

সত্যি তাই যেন হয় রহমান, তাই যেন হয়।

❑

মাঝে মাত্র আর দুটো দিন আছে দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ডের। দু'দিন পর জম্বু কারাগারে বনহুরকে ত্রিশূল বিদ্ধ করে গুলী করা হবে।

পত্রিকায় পত্রিকায় এ সংবাদ ছাপা হলো। লোকের মুখে মুখে সমস্ত শহরবাসীর ঘরে ঘরে প্রচার হলো দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ডের খবর। শুধু শহরেই নয়—দেশ হতে দেশান্তরে এ খবর গিয়ে পৌঁছলো।

দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ড সংবাদে খুশী হলো আনেকেই আবার অনেকে গোপনে দুঃখ প্রকাশ করতে লাগলো। দীনহীন অনাথগণ অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলো।

গ্রাম হতে গ্রামান্তরে, পথে—ঘাটে—মাঠে সবাই জানতে পারলো দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ডাদেশের কথা। সকলেরই একমাত্র বলার বস্তু হলো ঐ এক সংবাদ।

ধনপতিগণ নিজ নিজ আত্মীয়—স্বজন, বন্ধু—বান্ধবদের কাছে খুশীর সাথে এ সংবাদ পরিবেশন করতে লাগলো। এবার থেকে তারা নিশ্চিন্ত মনে তাদের কারবার ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যেতে পারবে। আর দস্যু বনহুরের ভয়ে তাদের কম্পিত হৃদয় নিয়ে কালাতিপাত করতে হবে না। টাকা—পয়সা নিয়ে পথ—ঘাট চলতে তেমন করে সাবধান হওয়ার প্রয়োজন হবে না। কত নিশ্চিন্ত এখন তারা। আরও অনেক কথা ধনবানদের মনে উদিত হলো বিশেষ করে কালো বাজারে যারা বেশ ফেঁপে উঠেছে তাদের মনে আনন্দের বান বয়ে গেলো। বনহুর গ্রেপ্তারের পর হতে একটা খুশীভাব তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো।

ধনবানগণ যেমন হয়েছিলো খুশী, অসহায়-অনাথ আতুর যারা, বনহুরের অনুগ্রহে যারা আজও বেঁচে আছে তাদের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হলো। অন্তরে শুধু আঘাতই পেলো না তারা তাদের বেঁচে থাকবার আশা ধূলিসাৎ হলো। বেচারা অন্ধ—আতুর-খঞ্জ সবাই খোদার কাছে দস্যু বনহুরের জন্য দোয়া চাইতে লাগলো।

বৃদ্ধা জরাগ্রস্ত অসহায় তারাও জায়নামাজে বসে দু'হাত তুলে বললো—হে পরওয়ারদেগার বনহুরকে তুমি রক্ষা করে নাও

জানি না খোদা মেহেরবান অনাথ—অসহায় দীনহীনদের দোয়া কবুল করলেন কিনা।

মরিয়ম বেগম পুত্রের জন্য খোদার দরগায় ফরিয়াদ জানালেন জায়নামাজে বসে মাথা ঠুকে দোয়া করতে লাগলেন তিনি। তাঁর ললাটের রক্তে রাঙা হয়ে উঠলো সেজদার স্থান। মায়ের এই আকুল আহ্বানে আকাশ বাতাস নীরবে যেন অশ্রু বিসর্জন করে চললো।

মনিরা এখনও শয্যাশায়ী, উঠা—বসা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।

খবর পেয়ে মনিরার বান্ধবীগণ এলো দেখা করতে। কিন্তু মনিরার অবস্থা দেখে তাদের দুঃখের সীমা রইলো না। সবাই মনিরার করুণ অবস্থায় মর্মাহত হলো।

মনিরার অসুস্থতার কারণ কি খুঁজে কেউ পেলো না। সবাই নানা কথা বলে তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

একটা ব্যাপার ঘটেছিলো—বান্ধবীরা আজও জানে না মনিরা বিবাহিতা, তার একটা সন্তানও জন্মেছে। এ কথা কেউ শোনেনি বা জানে না এখনও।

মনিরা কারও সঙ্গে মিশতো না বা কারও বাড়ি যেতো না তাই বান্ধবীরাও তার কাছে আসতো কম।

অবশ্য দস্যু বনহুরের সঙ্গে যে তার একটা সম্বন্ধ আছে, এটা গোপনে কেউ কেউ জানতো। কিন্তু তার সঙ্গে যে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ঘটে গেছে এটা কেউ জানতো না।

মনিরার কোলে যখন নূরকে অনেকেই দেখে অবাক হয়েছিলো তখন বলতো মনিরা—আমার বোনের ছেলে কিনা, আমাকে বড় ভালোবাসে, 'আম্মা' বলে ডাকে।

মরিয়ম বেগমও সায় দিতেন মনিরার কথায়। কাজেই অবিশ্বাস করবার কিছুই ছিলো না।

সেদিন মনিরার বান্ধবীগণ অনেকেই এলো মনিরাকে দেখতে। সবাই ওকে ঘিরে ধরে বললো—হঠাৎ কি হলো মনিরা তোর?

মনিরা কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করেই রইলো।

মরিয়ম বেগম বললেন—একটা কঠিন অসুখ হয়েছিলো মা তাই ওর এই অবস্থা। চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে।

সবাই ব্যথায় অনুতাপে মুষড়ে পড়লো, দুঃখ করলো অনেকে।

মরিয়ম বেগম এক সময় বেরিয়ে যেতেই বললো সাহানা মনিরার বিশিষ্ট বান্ধবী সে—আচ্ছা মনি, চিরদিন কি তুই এমনি করে কাটিয়ে দিবি?

কি রকম? বললো মনিরা।

বিয়ে করবিনে?

বিয়ে! হাসলো মনিরা—বিয়ে আমার হয়ে গেছে অনেক দিন।

নেকামি করিসনে মনি, সত্যি তুই ভুল করেছিস।

ভুল! কেন?

বিয়ে না করে।

আজ সত্যি কথা না বলে পারলো না— বললেন মনিরা। আঁচলে অশ্রু মুছে বললো এতদিন তোদের কাছে যে কথা গোপন করেছি আজ বলবো তোরা বিশ্বাস করবিতো?

নিশ্চয়ই করবো। বললো সাহানা।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করলেন সরকার সাহেব—সঙ্গে তার ডাক্তার।

তখনকার মত বলা আর হলো না।

বান্ধবীগণ সেদিনের মত বিদায় নিয়ে চলে গেলো।

সাহানা অবশ্য মনিরার অনেক খবরই জানতো। দস্যু বনহুরই যে চৌধুরীবাড়ীর ছেলে—এ কথাও সে জানতো, আরও জানতো, মনিরার সঙ্গে প্রেমও ঘটেছে বনহুরের। জানতো না তাদের আর কোনো সম্পর্কের কথা।

মনিরার বান্ধবীদের মধ্যে অনেকেরই বিয়ে হয়েছিলো—বাকিও ছিলো অনেকের। তারা কেউ কেউ উচ্চাশিক্ষা লাভ করেছিলো। মনিরার বান্ধবী মহলে মনিরা ছিলো সকলের চেয়ে সুন্দরী আর গুণবতী। তাই অনেকেই তাকে ঈর্ষা করতো ভিতরে ভিতরে।

বান্ধবী মহলে মনিরা ছিলো তাদের আলোচনার বস্তু। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও মনিরার সান্নিধ্য আজকাল তাদের বড় একটা ঘটে না। মনিরা তো কারও বাড়ী যাবেই না, ওরা এসে দেখা করে তার সঙ্গে। তবুও সবাই ঈর্ষা করে মনিরাকে। বড় লোকের মেয়ে বড় লোকের ভাগ্‌নী—তাই নাকি এত অহঙ্কার ওর।

আজ অনেক দিন হলো বান্ধবীরা মনিরার বাড়ী আসা ছেড়েই দিয়েছিলো। বাইরে থেকে নানা জনে নানা রকম মনোভাব পোষণ করতো তার সম্বন্ধে। মনিরা, রূপবতী, গুণবতী, ধনবতী—তাই নাকি তার গর্ব। সেই কারণে বান্ধবীরা তাকে এড়িয়ে চলতো সম্পূর্ণরূপে। কিন্তু আসলে মনিরা ছিলো ভিন্ন রকম। গর্ব বলে তার কিছুই ছিলো না, নিজেকে অপয়া বলে সব সময় সরিয়ে রাখতো সবার কাছ থেকে।

আজ মনিরার বান্ধবীদের সেই ভুল ভেঙে গেলো, যখন তারা নিজের চোখ দেখলো মনিরা তাদের কাছে ঠিক পূর্বের ন্যায়ই আছে এতটুকু অহঙ্কার বা গর্ব নেই। মনিরার ব্যথায় সবাই ব্যথিত হলো। বাড়ী ফিরে দুঃখ করতে লাগলো সকলে। মনিরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে—এটাই তাদের বড় দুঃখের কারণ।

সবচেয়ে বান্ধবীদের মধ্যে জুলেখাই ছিলো মনিরার প্রিয় বান্ধবী। বহুদিন বিদেশে শিক্ষা লাভ করার পর ফিরে এসেছে জুলেখা, মনিরার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সবচেয়ে বেশী ব্যথিত হলো সে।

জুলেখা ধনবান জাহাঙ্গীর শাহর সর্বকনিষ্ঠা কন্যা। জাহাঙ্গীর শাহ কান্দাই শহরের বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। চৌধুরী বাড়ীর প্রায় সমকক্ষই বলা চলে তাদের।

চৌধুরী সাহেব আর জাহাঙ্গীর শাহ বন্ধু লোক ছিলেন। এক সঙ্গে মেলামেশা, খানাপিনা বা ফাংশনে যোগদান করা সবই ছিলো তাঁদের এক সাথে। জাহাঙ্গীর শাহ ধনবান ব্যক্তি হলেও তাঁর মন বা হৃদয় নীচ ছিলো না। ন্যায়ভাবে অর্থ উপার্জনই ছিলো তাঁর নীতি।

চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তাই জাহাঙ্গীর শাহ্‌র হৃদ্যতা কোনোদিন এতটুকু লাঘব হয়নি।

চৌধুরীবাড়ি আর শাহ্‌বাড়ীর দূরত্ব ছিলো বেশ কিছু, প্রায় মাইল দুই। তবু চৌধুরী বাড়ির সঙ্গে মেলামিশায় কোনোদিন বিঘ্ন ঘটেনি শাহ্‌বাড়ির।

মনিরা আর জুলেখার মধ্যেও ছিল তাই অভেদ্য ভালবাসা। উভয়ে উভয়ের কাছে ছিলো এক মন এক প্রাণ। জুলেখার সঙ্গে মনিরা যেমনভাবে মিশতো তেমন করে আর কারও সঙ্গে মিশতে পারেনি। যদিও মনিরা ছিলো আর্টসের ছাত্রী ও জুলেখা সায়েন্সের ছাত্রী। স্কুলজীবনের প্রীতি তাদের দু'জনকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছিলো শক্ত করে। কলেজ জীবনেও ওরা দু'জন দু'জনের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেনি কোনোদিন।

মনিরাই ওকে নিজের গাড়ীতে কলেজে নিয়ে যেতো প্রতিদিন। একসঙ্গে কলেজে যাওয়া থেকে একসঙ্গে সব কিছু চলতো ওদের দু'জনের মধ্যে।

হঠাৎ জুলেখার সঙ্গে মনিরার ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিলো ওরা উভয়ে যখন কলেজ থেকে পাশ করে বের হলো। মনিরা মামা মামীর নয়নের মণি, কাজেই তাকে কান্দাই শহরেই এম এ ক্লাশে ভর্তি হতে হলো আর জুলেখা চলে গেলো বিদেশে। পিতামাতার ইচ্ছা—সর্বকনিষ্ঠা কন্যা জুলেখাকে তাঁরা বিলেতে পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাবেন। আরও দু'টি কন্যা শাহ্ সাহেবের কাজেই কনিষ্ঠাকে দূরে পাঠাতে তাঁরা দ্বিধা করলেন না। বিশেষ করে জাহাঙ্গীর শাহর ইচ্ছা—কন্যাকে তিনি ডক্টর করবেন।

পিতার বাসনা পূর্ণ করবার জন্য জুলেখা বিদেশে যাত্রা করলো।

এরপর থেকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলো উভয়ের। মনিরাও সেদিন এরোড্রামে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়েছিলো জুলেখাকে। উভয়ের মধ্যে ছিলো এতো গভীর ভালবাসা— মনিরা জুলেখাকে বিদায় দিতে গিয়ে কিছুতেই অশ্রুসম্বরণ করতে পারেনি।

জুলেখা বিদেশে চলে যাবার পর বেশীদিন ক্লাশ করতে পারেনি মনিরা। নানা দুর্যোগের ঘনঘটা তার জীবনাকাশে এক অন্ধকারময় বিভীষিকা এনে দিয়েছিলো। মামুজানের আকস্মিক মৃত্যু চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়েছিলো মনিরার সমস্ত হৃদয়টাকে। এম এ পড়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মনিরা আর ক্লাশ করতে পারেনি।

সেই থেকে মনিরার জীবনে শুরু হয়েছে নানা ঘাত-প্রতিঘাত।

জাহাঙ্গীর শাহ কন্যাকে বিদেশে পাঠিয়ে হঠাৎ কঠিন অসুখে পড়ে গেলেন, শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর শাহও বন্ধুর পথ অনুসরণ করলেন—মৃত্যু হলো তাঁর। এক পুত্র এবং তিনকন্যা রেখে তিনি পরপারে যাত্রা করলেন।

পুত্র উপযুক্ত ছিলো, কাজেই তাঁর কারবার এবং সংসার দেখা শোনার দায়িত্ব গ্রহণ করলো সে—ই। জাহাঙ্গীর শাহর পুত্রের নাম ছিলো নাসির শাহ্।

পিতা যেমন ছিলেন সৎ ব্যক্তি, পুত্র তেমন ছিলো অসৎ। নানা ভাবে অর্থ উপার্জনে কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করলো। ক্লাব পার্টি—এসব ছিল নাসির শাহের নেশা। এমন কি মদ পানও করতো সে।

জুলেখা বিদেশে, অন্য বড় বোন দু'টি বিয়ে হয়ে তারা শশুর বাড়ী, কাজেই নাসির শাহর কাজে বাধা দেবার কেউ ছিলো না।

সংসারে শুধু মাত্র বৃদ্ধা মা তাঁর কথা কানেই নিতো না নাসির শাহ্। নিজের ইচ্ছামত সে কাজ করতো মা কিছু বললে বলতো —তুমি আমার চেয়ে বেশী বোঝো না মা। কি করতে হয় না হয় আমিই জানি।

জাহাঙ্গীর শাহ্র স্ত্রী সুলতান বেগম আর কিছু বলতেন না। তিনি জানতেন, সন্তান তাঁর কত মন্দ।

দীর্ঘ সাত বছর পরে ফিরে এলো জুলেখা শুধু ডক্টর উপাধি লাভ করে নয়, হাতে-নাতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে। বিলেতে কিছুদিন কাজ করার পর দেশে ফিরে এলো সে।

জুলেখা দেশে ফিরেই প্রথমে পিতার অভাব অনুভব করলো দারুণভাবে। কিন্তু যিনি গেছেন আর তাকে ফিরিয়ে আনা যাবে না, তাই জুলেখা বৃদ্ধা মাকে বুকে চেপে ধরে পিতার অভাব পূরণ করল।

বড় ভাই নাসির শাহ্ বোনকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে নিয়ে এলো এরোড্রাম থেকে।

জুলেখা দেশের মাটিতে পা রেখেই আর একজনকে সন্ধান করছিলো, সে হচ্ছে মনিরা।

কিন্তু বাড়িতে কয়েক দিন কাটানোর পর যখন মনিরার কোনো সন্ধান পেলো না জুলেখা, তখন সে স্বয়ং গেলো তার সঙ্গে দেখা করতে।

চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছে মনিরার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ ঘটলো জুলেখার তখন বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে গিয়েছিলো সে—মনিরা আজ দৃষ্টিহীন—অন্ধ। কিছুতেই সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না মনিরা সত্যই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। নিজকে সংযত রাখা কষ্টকর হয়ে পড়েছিলো জুলেখার পক্ষে মনিরাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো সে—মনিরা, তুই অন্ধ হয়ে গেছিস। এ যে আমি বিশ্বাস করতে পারছিনে--

অনেক কেঁদেছিলো জুলেখা মনিরাকে বুকে আঁকড়ে ধরে। অনেক প্রশ্নই করেছিলো সে তাকে। কিন্তু মনিরা শুধু নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছিলো, একটি জবাবও দেয়নি—দিতে পারেনি সে।

কি করে দেবে—মনিরার অন্তরের বেদনা যে কাউকে বলবার নয়। মনের আগুন মনেই জ্বলছে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার গন্ড বেয়ে। প্রিয় বান্ধবীকে পেয়েও মনের গোপন ব্যথা জানাতে পারে না সে।

মনিরা কিছু না বললেও জুলেখা আন্দাজ করে নিয়েছিলো নিশ্চয়ই মনিরার জীবনে এমন কিছু ঘটেছে যার জন্য সে আজ এমনভাবে মুষড়ে পড়েছে। তার মনে নানারকম কথাই জাগলো। হয়তো মনিরা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে এভাবে ভেঙে পড়েছে।

বাড়ি ফিরেও জুলেখা মনিরাকে নিয়েই চিন্তা করতে লাগলো। কি করে মনিরার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনা যায়। সে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার মানুষের জীবন নিয়েই তাকে গবেষণা করতে হবে। রোগীকে আরোগ্য লাভ করানোই এখন তার জীবনের ব্রত।

মনিরা সম্বন্ধে বাড়ীতে কারও সঙ্গে আলোচনা করা সমীচীন মনে করলো না জুলেখা। কারণ সে জানতো, মনিরাকে বিয়ে করার জন্য এক সময় তার বড় ভাই নাসির শাহ্ উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো যদিও প্রকাশ্যে নাসির মনিরাকে কোনোদিন কিছু বলেনি বা বলাবার সুযোগ পায়নি, কিন্তু গোপনে সে অনেক কৌশল অবলম্বন করেছিলো।

জুলেখা ভাইকে জানতো, চরিত্রহীন ভাইয়ের পাশে কোনো সময় মনিরাকে কল্পনা করতে পারতো না।

একদিনের কথা আজও মনে পড়ে জুলেখার। সেদিন কলেজ থেকে ফিরে জুলেখা আর মনিরা তাদের বাসায় ঘরে বসে গল্প করছিলো। বাইরে তখন ঝুপঝাপ বৃষ্টি পড়ছে। অল্পক্ষণের মধ্যে বৃষ্টির বেগ এত বেড়ে গেলো বাইরে বের হওয়াই মুস্কিল হয়ে পড়লো। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে মনিরা উদগ্রীব হয়ে উঠলো বাসায় ফিরবার জন্য। সেদিন কিন্তু মনিরা জুলেখাদের বাড়ীতে কলেজ থেকে ফিরেছিলো। জুলেখাদের বাসায় যাবে বলে মনিরা ছেড়ে দিয়েছিলো। নিজেদের গাড়ী, ফেরার সময় ওদের গাড়ীতে ফিরবে আর কি। কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি পড়তে শুরু করলো। গল্পে গল্পে বেলাও শেষ হয়ে গেলো। বৃষ্টির বেগ ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। মনিরা বারবার হাতঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছে। হাসছিলো জুলেখা। এমন সময় নাসির সেই কক্ষে প্রবেশ করলো। ভাইকে হঠাৎ তাদের বসবার ঘরে প্রবেশ করতে দেখে একটু চমকে উঠেছিলো জুলেখা।

নাসির হেসে বলেছিলো—এসো মনিরা, তোমাকে বাড়ী পৌছে দিয়ে আসি।

নাসির শাহ্র ভিতরের খবর অতো জানতো না মনিরা। জুলেখার বড় ভাই হিসেবে সে তাকে যথেষ্ট সম্মান করতো। আজ মনিরা সত্যি বিপদে পড়ে গিয়েছিলো, সন্ধ্যা গড়িয়ে গেছে অনেক্ষণ, মামা—মামী হয়তো উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, শীঘ্র তাকে বাড়ী পৌঁছতেই হবে।

নাসির শাহ্‌র কথায় মনিরা খুশী হয়ে উঠে দাঁড়ালো—চলি তাহলে জুলেখা?

কিন্তু জুলেখার মুখে নজর পড়তেই মনিরা চমকে উঠলো। গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে সে ভাইয়ের মুখের দিকে দৃঢ়কণ্ঠে বললো জুলেখা—তুমি যাও ভাইয়া। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। ড্রাইভারের সঙ্গে আমিই যাবো।

নাসির শাহ্ ক্রুদ্ধভাবে একবার জুলেখার দিকে তাকিয়ে গট্ গট্ করে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

এই রকম আরও বহুবার মনিরাকে হাতের মধ্যে আনার জন্য চেষ্টা নিয়েছিলো নাসির শাহ্। জুলেখাকেও এজন্য অনেক কথা বলেছে সে। কিন্তু জুলেখা প্রিয় বান্ধবীর অমঙ্গল চিন্তা করতে পারেনি। কোনোদিন।

বিলেত থেকে ফিরে নাসির শাহর আচরণ দেখে জুলেখার মন একেবারে ভেঙে গিয়েছিলো। মদপান আর ক্লাব ফাংশন তার নিত্য সহচর। চরিত্রহীন ভাইয়ের জন্য জুলেখা প্রাণে ব্যথা পেয়েছিলো যেমন, ঘৃণাও হয়েছিলো তেমনি এবং সেই কারণেই মনিরা সম্বন্ধে কোনো কথা বাড়ীতে কারও কাছে বলতে পারলো না।

বান্ধবী হয়ে বান্ধবীর চিন্তায় মগ্ন রইলো।

❑

অসংখ্য অশ্বারোহী দস্যু সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান। সকলেরই পিঠের সঙ্গে রাইফেল ঝুলছে। কারও কারও হাতে তীর ধনু আর বর্ষা।

প্রত্যেকের দেহে জমকালো পোষাক পায়ে বুট, মাথায় পাগড়ী আর গালপাট্টা বাঁধা। এক একজনের চেহারা অতি ভয়ঙ্কর। মস্ত মস্ত গোলাকার চোখ, মাথায় খোচা, খোচা চুল-শরীরের রং প্রায় সকলেরই কালো। মস্ত মস্ত একজোড়া গোঁফ, দেখলেই ভয় হয়। অনেকেরই মুখে এখানে—সেখানে ক্ষতিচিহ্ন।

সকলের মাঝখানে অশ্বপৃষ্ঠে রহমান, দ্বিতীয় অশ্বে নূরী। নূরীর দেহেও আজ পুরুষের ড্রেস পিঠে রাইফেল ঝুলছে। মাথায় পাগড়ী গালপাট্টা বাঁধা তাকে দেখলে কেউ নারী বলে ভ্রম করবে না। একটা সুন্দর যুবক বলেই মনে হয়।

রহমান সবাইকে লক্ষ্য করে বললো—ভাই, আজ আমাদের সর্দারকে উদ্ধারের দিন। আমরা নিজেদের জীবন দিয়ে হলেও সর্দারকে রক্ষা করবো। হয়তো আমাদের অনেকেই আর ফিরে আসবে না। কিন্তু দেহে প্রাণ থাকতে সর্দারকে উদ্ধার না করে ফিরবো না—বলো, তোমরা শপথ করো আমার সামনে।

অসংখ্য কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হলো আমরা শপথ করছি, সর্দারকে উদ্ধার না করে ফিরবো না।

বনভূমি প্রকম্পিত হলো দস্যুগণের বজ্রধ্বনিতে।

রহমান আনন্দসূচক শব্দ করলো—সাবাস!

রহমানের ইংগিতে সমস্ত দস্যু অনুচর নিজ নিজ অশ্বের লাগাম টেনে ধরলো। এবার উল্কাবেগে ছুটতে শুরু করলো অশ্ব গুলো। রাত্রির অন্ধকারে তারা জম্বুর গমনপথের দুই পাশে ছোট ছোট পাহাড় আর জঙ্গলে লুকিয়ে থাকবে।

রাত্রি ভোর হবার পূর্বেই হাঙ্গেরী কারাগার থেকে দস্যু বনহুরকে নিয়ে পুলিশ ভ্যান জম্বুর পথে রওয়ানা হবে। জম্বুর কারাকক্ষে ত্রিফলা বিদ্ধ করে গুলী করে হত্যা করা হবে।

পথের দুই পাশে জঙ্গলে আর পাহাড়ে লুকিয়ে পড়লো বনহুরের অনুচরগণ। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলো।

ওদিকে হাঙ্গেরী কারাগার প্রাঙ্গেণে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ালো প্রায় পচিশখানা পুলিশ ভ্যান। অগণিত পুলিশফোর্স গুলীভরা রাইফেল হাতে সতর্কভাবে দন্ডায়মান যেন পুলিশ বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছেন কয়েকজন পুলিশ অফিসার। প্রত্যেকের দেহেই সরকারী ড্রেস কোমরে বেল্টে গুলী ভরা রিভলবার।

পুলিশ সুপার কাওসার আহমদ স্বয়ং মিঃ আহমদ ও মিঃ জাফরী সহ বনহুরের কারাকক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। সংগে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ।

বনহুর তার মৃত্তিকা শয্যায় বসেছিলো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে একটু পূর্বে তাকে নিদ্রা থেকে জাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। এতক্ষন বনহুর নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিলো।

পুলিশ সুপার কাওসার আহমদের আদেশে কারাকক্ষের দরজা কড় কড় শব্দে খুলে গেলো।

উদ্যত রিভলভার হাতে কারাকক্ষে প্রবেশ করলেন পুলিশ ফোর্সসহ স্বয়ং পুলিশ সুপার ও পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয়।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো নিজের ইচ্ছায়।

পুলিশ সুপার ও পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয় রিভলবার উদ্যত করে আছেন বনহুরের বুক লক্ষ্য করে।

তাছাড়াও পুলিশগণ গুলীভরা রাইফেল বাগিয়ে ধরে আছে তার চারপাশে।

মিঃ আহমদের নির্দেশে একজন পুলিশ বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিলো।

আরও কয়েকজন বনহুরের সমস্ত শরীরে শিকল দ্বারা মজবুত করে বেঁধে ফেললো।

বনহুরের মুখে নেই তবু ভীতির চিহ্ন, দীপ্ত সে মুখমন্ডল।

পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত হয়ে পুলিশ ভ্যানে উঠে বসলো দস্যু বনহুর।

মাঝখানের ভ্যানে বনহুর, সম্মুখে এবং পিছনে বহু সংখ্যক পুলিশ ভ্যান।

হাঙ্গেরী কারাকক্ষ হতে ভ্যানগুলো বেরিয়ে সোজা চলতে শুরু করলো।

আজ কান্দাইয়ের পথের দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অসংখ্য জনতা,সবাই একনজর দেখতে চায় দস্যু বনহুরকে। যে দস্যুর নামই শুধু তারা শুনে-এসেছে এতদিন, আজ একবার চাক্ষুস দেখতে চায় তারা।

পরে স্থান যদি না পায় সেইজন্য গভীর রাত থেকে পথের ধারে ভীড় করে জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই। পথের দুই পাশে কোথাও তিল পরিমাণ স্থান নেই। লোকে লোকারণ্য। বৃদ্ধ-যুবক, শিশু-নারী-পুরুষ সবাই দস্যু বনহুরকে দেখবে বলে দাঁড়িয়ে আছে।

কান্দাইয়ের মহারাজ এলেও পথের ধারে এত ভীড় জমে উঠেনা,দস্যু বনহুরকে দেখবার জন্য প্রতিটি নরনারীর যত ভীড় জমে উঠেছিলো।

শুধু পথের দুই পাশে নয়, প্রত্যেকটা বাড়ীর ছাদে এত নারী পুরুষ জমে গেছে, দেখলে বিস্ময় জাগে। শুধু মানুষ আর মানুষ—কান্দাই শহরে এত মানুষ আছে, আজ যেন সবাই তা বুঝতে পারে।

গাছের শাখায় শাখায়, প্রাচীরের উপরে যে কোনো উচ্চ স্থানে—যেখানে থেকে বনহুরকে দেখা যাবে সব জায়গায় ভীড় আর ভীড়।

কান্দাই পথ আজ জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে।

লক্ষ লক্ষ লোকের দৃষ্টি আজ পথের দিকে। পা ব্যথা হয়ে গেছে তবু কারও নড়বার নামটি নেই। কারণ, একটু সরে পড়লেই তার স্থানে যদি অন্য কেউ এসে দাঁড়িয়ে পড়ে!

স্থানচ্যুতির ভয়ে কেউ একটু নড়ছে না পর্যন্ত। সকলেরই চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দস্যু বনহুরকে দেখবার বিপুল উন্মাদনা। অন্তরের সমস্ত অনুভূতি নিয়ে প্রতীক্ষা করছে সবাই—একটুখানি দেখবে তাকে। যার নাম শুনে তাদের হৃদকম্প শুরু হতো। যার নামে দেশবাসীর মনে এত আতঙ্ক।

যার নামই শুধু শুনে এসেছে এতদিন, কোনদিন তাকে দেখেনি কেউ,সেই দস্যু বনহুরকে আজ স্বচক্ষে দর্শন করবে। একটু স্থানের অভাবে যদি তাকে দেখতে না পায়। এমন সুযোগ আর কোন দিন তাদের জীবনে আসবে না।

দস্যু বনহুরকে স্বচখে দেখেছে—এটাই হবে যে তাদের মস্তবড় একটা বলবার মত কথা। বংশানুবংশক্রমে তারা বলতে পারবে তাদের পুত্র-কন্যাদের কাছে রং লাগিয়ে চটক্‌দার কাহিনী হিসাবে।

কিন্তু এত আগ্রহশীল দর্শকবৃন্দের আশা সফল হবে কিনা কে জানে।

অসংখ্য পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত দস্যু বনহুরকে তাদের নজরে পড়বে কিনা তাইবা কে বলতে পারে!

দর্শকগণ নীরবে দাঁড়িয়ে নেই, তাদের মধ্যে বনহুরকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা চলছে। তার চেহারার নানা জনে নানা রকম বর্ণনা দিচ্ছে। অদ্ভুত অদ্ভুত সে সব কথা। কেউ বলছে,দস্যু বনহুরের বিরাট চেহারা, মস্তবড় মাথা, বড় বড় চোখ, হেঁইয়া গোঁফ, হাতগুলী লোহার-সাড়াশির মত শক্ত, দেহটা রাক্ষসের মত দেখতে। কেউ বলছে, বনহুর মানুষই নয়—একটা অসুর; কেউ বলছে, বনহুর সুন্দর সুপুরুষ, এত সুন্দর মানুষ নাকি হয় না।

দর্শকগণ যখন বনহুরকে নিয়ে নানা রকম আলোচনায় ব্যস্ত, তাকে দেখার জন্য উদগ্রীব, তখন পুলিশ ভ্যানগুলো জনসমুদ্রের মাঝ দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

মধ্যের ভ্যানটিতে দস্যু বনহুর এবং পুলিশ ইন্সপেক্টারদ্বয় রয়েছেন আর আছে কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ।

কান্দাই শহরের বিশিষ্ট পথ ধরে ভ্যানগুলো এগিয়ে চলেছে। অসংখ্য জনতা ভীড় করে ঝুঁকে আসছে ভ্যানগুলোর দুই পাশে, সবাই দেখতে চায় দস্যু বনহুরকে।

পুলিশ ভ্যান এগুনো সম্ভব হচ্ছে না আর। একেবারে জনগণ ভ্যানের উপরে এসে পড়েছে সবাই জটলা করে।

পুলিশ কিছুতেই হটাতে পারছে না তাদের।

গাড়ী যখন থেমে পড়লো অমনি অসংখ্য জনতা জটলা করে ঝুঁকে পড়লো বনহুরের ভ্যানটার উপরে।

একেবারে এভাবে জনতা ভেংগে পড়বে কল্পনা করতে পারেনি পুলিশ বাহিনী বা ইন্সপেক্টারদ্বয়।

জনতাকে সামলানো কঠিন হয়ে পড়লো।

সমস্ত পুলিশ বাহিনী ক্ষণিকের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়লো জনতার চাপে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বনহুর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় লাফিয়ে পড়লো জনসমুদ্রে। হট্টগোল আর কলরবে জনতার ভীড়ে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পুলিশ রাইফেল উদ্যত করে আছে কিন্তু গুলী ছুড়তে সক্ষম হলো না, অসংখ্য জনতার মধ্যে কোথায় গুলী ছুড়বে তারা।

মিঃ আহমদ ও মিঃ জাফরী চীৎকার করে উঠলেন—গ্রেপ্তার করো, গ্রেপ্তার করো, দস্যু বনহুর পালিয়েছে.....

লক্ষ কণ্ঠের কলরবে পুলিশ অফিসারদ্বয়ের কণ্ঠ মিশে গেলো। পুলিশ তবুও ভীড় ঠেলে ছুটলো, জনগণের ভীড়ে খুঁজতে লাগলো দস্যু বনহুরকে।

এদিকে জনতা যখন জানতে পারলো দস্যু বনহুর তাদের মধ্যেই আত্মগোপন করে পালিয়েছে, তখন এক মহা হই হুল্লোড় শুরু হলো। যে যেদিকে পারলো পালাতে লাগলো। ভয়ে সকলেরই মুখ বিবর্ণ ফ্যাকাশে হলো।

পুলিশ বাহিনী কিছুতেই জনতাকে আয়ত্তে আনতে পারছে না। যে যেদিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। 'চাচা আপন জীবন বাঁচা' এ অবস্থা সকলের। যে যার টাকা-পয়সা, অলঙ্কার সামলানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। যুবতীগণ যেদিকে পারলো নিজেদের সামলাতে লাগলো, ভয় দস্যু বনহুর তাদের কাউকে হরণ করে নিয়ে না যায়। কর্তাগণ ছুটলেন নিজ নিজ বাড়ী সামলাতে।

আধঘন্টার মধ্যেই জনসমুদ্র, জনহীন রাজপথে পরিণত হলো। শুধু পুলিশের বাঁশীর শব্দ আর তাদের ভারী বুটের আওয়াজ বিক্ষিপ্তভাবে শহরের রাজপথ অলিগলি মুখর করে তুললো।

সঙ্গে সঙ্গে কান্দাই শহরের রাজপথে যানবাহন, লোক চলাচল বন্ধ হয়ে গেলো। শুধু পুলিশের ভ্যানগুলো এদিক থেকে সেদিক উল্কাবেগে ছুটাছুটি করতে লাগলো।

প্রতিটি বাড়ীতে পুলিশ অনুসন্ধান চালালো।

প্রত্যেকটা অলিগলি, বাড়ীর ছাদ, সিড়িঘর, আনাচে-কানাচে খুঁজতে লাগলো পুলিশ বাহিনী।

শুধু পুলিশ বাহিনী নয়, যার যার নিজ নিজ বাড়ীতে পুংখানু পুংখরূপে অনুসন্ধান করে চললো বাড়ীর মালিকগণ। সকলেরই বুক দুরু দুরু কাঁপছে। আতঙ্কগ্রস্ত হৃদয় নিয়ে সবাই খাটের নীচে, দরজার পাশে, আলমারীর পেছনে, বাথরুমে সন্ধান চালিয়ে চলেছে।

কিন্তু কোথায় বনহুর, সেকি হাওয়ায় উড়ে গেলো।

সমস্ত শহর তন্নতন্ন করে সন্ধান চললো। হোটেল-রেষ্টুরেন্ট-ক্লাব, সিনেমা হল, ছোটখাটো দোকানপাট সব জায়গাতেই খোঁজাখুজি চললো, কিন্তু কোথাও বনহুরকে খুঁজে পাওয়া গেলো না।

পুলিশ মহলে ভীষণ তোড়জোড় শুরু হলো। প্রত্যেকটা রাস্তায়, পথের বাঁকে ষ্টিমার ঘাটে, ফেরিঘাটে, টেলিফোন যোগে জানিয়ে দেওয়া হলো—দস্যু বনহুর পালিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ফোর্স ছুটলো। স্থানে স্থানে পাহারায় নিযুক্ত রইলো পুলিশগণ।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহম্মদ কয়েকজন পুলিশ অফিসার সহ হন্তদন্ত হয়ে ছুটাছুটি শুরু করলেন। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে তাঁকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছিলো, অনেক অসাধ্য-সাধনা করেই তবে তিনি জয়ী হতে পেরেছিলেন।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেছিলেন। তাঁর দক্ষ বুদ্ধি কৌশলকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলো। যথেষ্ট সুনামও অর্জন করেছিলেন তিনি। পুরস্কৃতও হয়েছিলেন—সরকার বাহাদুর লক্ষ টাকা তাঁকে দিয়েছেন দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য।

পুলিশ সুপার কাওসার আহমদ সাহেব আজ স্বয়ং উপস্থিত থেকে দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করবেন। সমস্ত দেশবাসীকে ভয়ঙ্কর দস্যুর কবল থেকে নিস্কৃতি দেবেন। আজ থেকে হবে সকল চিন্তার অবসান। কিন্তু সব পণ্ড হয়ে গেলো, পুলিশ বাহিনীর এত পরিশ্রম সব বিফলে গেলো। পুলিশ সুপার ব্যস্তভাবে এখানে সেখানে, বিভিন্ন থানা, পুলিশ অফিসে টেলিগ্রাম করে চললেন।

সমস্ত পুলিশ বাহিনীর ব্যস্ততার সীমা নেই। বাসায় ফেরা তো দূরের কথা, এতটুকু নিশ্বাস ফেলার সময় নেই কারও।

❑

পুলিশ সুপার কাওসার আহমদ সাহেবের বাসা।

পড়বার ঘরে বসে সুফিয়া বইয়ের পাতা উল্টে চলেছে, কয়েক দিন পর তার এম, এ, ফাইনাল পরীক্ষা। কিন্তু কিছুতেই বইয়ে মন দিতে পারছে না। যেদিন শুনেছে সুফিয়া দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে, সেদিন হতেই তার বুকের মধ্যে একটা তোলপাড় শুরু হয়েছে। দস্যু বনহুরের সঙ্গে তার যে একটা গভীর সম্বন্ধ রয়েছে।

আজ ক'দিন থেকে সুফিয়ার চোখে ঘুম নেই, আহারে রুচি নেই। সব সময় গভীর চিন্তায় মগ্ন। বারবার মনে পড়ছে তার কথা—কার দয়ায় আজ সে ফিরে পেয়েছে নিজের জিন্দেগী, নিজের ইজ্জৎ। ঝিন্দ রাজকুমার মঙ্গল সিন্ধের লালাপূর্ণ কবল থেকে যে তাকে রক্ষা করেছিলো, সে অন্য কেউ নয়—স্বয়ং দস্যু বনহুর।

শুধু তাকে রক্ষা করেনি সে, বড় ভাইয়ের স্নেহ-মায়া-মমতা দিয়ে গভীরভাবে ভালোবেসেছিলো। সুফিয়া আজও ভুলতে পারেনি তাকে, কোনো দিন ভুলতে পারবে না।

দস্যু হলেও তার অন্তরের যে পরিচয় সুফিয়া পেয়েছে, তা ফেরেস্তার চেয়েও মহান। শুধু মানুষ হলেই নয়; হৃদয় যার উন্নত—মহৎ, সেই তো মানুষ।

পৃথিবীর সবাই যদি দস্যু বনহুরকে ঘৃণা করে, তার সুন্দর চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করে—সুফিয়া পারবে না তাকে অবিশ্বাস করতে।

আজ দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ড।

সুফিয়া পিতাকে বিদায় দিয়ে তার নিজের ঘরে এসে বই নিয়ে বসেছে, কিন্তু বইয়ের পাতা উল্টেই যাচ্ছে শুধু সে—একটা অক্ষর তার চোখে পড়ছে না। মন তার চলে গেছে দূরে—বহু দূরে সেই অতীতে হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে...বিনয় সেন বেশে দস্যু বনহুর, আর নিজের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে স্মরণ হতে লাগলো। সৌম্য-সুন্দর পুরুষোচিত দীপ্ত একখানা মুখ ভেসে উঠতে লাগলো সুফিয়ার চোখের সামনে, সে কিছুতেই নিজকে সংযত রাখতে পারছে না। দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ড সংবাদে অসহ্য একটা বেদনা অনুভব করছে সুফিয়া মনের কোণে; ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার গন্ড বেয়ে পুস্তকের উপরে....হঠাৎ একটা শিকলের শব্দ ঝনাৎ করে উঠে তার কানে; চমকে ফিরে তাকায় সুফিয়া, বিস্ময়ে আরষ্ট হয়ে যায় সে। তার বইয়ের সেলফের পেছন থেকে এগিয়ে আসে দস্যু বনহুর। সমস্ত শরীরে তার শিকল বাঁধা, হাতে হাতকড়া।

'সুফিয়া বিস্ময় বিস্ফারিত নয়নে দাঁড়িয়ে, মুখে তার কোনো কথা বের হচ্ছে না—একি সে স্বপ্ন দেখছে না সত্য!

বনহুর বুঝতে পারে, সুফিয়া তাকে এখানে দেখে বিস্ময়ের চরম সীমায় পৌছেছে। বিস্মিত হবার কারণও বটে। বনহুর তার সামনে এসে দাঁড়ালো—সুফিয়া, মৃত্যুর কবল থেকে পালিয়ে এসেছি।

এতক্ষণে অস্ফুটধ্বনি করে উঠলো সুফিয়া ভাইয়া। ঠিক সেই মুহূর্তে টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো ক্রিং ক্রিং করে। সুফিয়া রিসিভার হাতে তুলে

নিয়ে কানে ধরতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো তার পিতার উদ্বিগ্ন কণ্ঠ—হ্যালো সুফিয়া; বড় দুঃসংবাদ।

হ্যালো, বলুন? বললো সুফিয়া। গলার আওয়াজ কেমন কেঁপে গেলো তার।

ওদিক থেকে বললেন পুলিশ সুপার—দস্যু বনহুর পালিয়েছে, আমাদের পুলিশ ফোর্সের চোখে ধূলো দিয়ে সে অসংখ্য জনতার মধ্যে আত্মগোপন করেছে.....

সুফিয়া কোন কথা বলতে পারছে না, চুপ করে শুনে যাচ্ছিলো। ওপাশ থেকে আহমদ সাহেবের ব্যস্তকণ্ঠ—হ্যালো সুফিয়া, হ্যালো....

হ্যালো বলুন আব্বা?

সুফিয়া, তোমার গলার আওয়াজ স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। হ্যালো হ্যালো সুফিয়া, কি হয়েছে?

কিছু না।

সুফিয়া, দস্যু বনহুর এখন শহরের মধ্যে কোনো স্থানে আত্মগোপন করে আছে। শহরের বিভিন্ন পথে-ঘাটে সর্বস্থানে তার সন্ধানে পুলিশ বাহিনী ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে। সমস্ত পথে পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে। কোনোক্রমে সে এখন শহরের বাইরে পালাতে পারবে না। হ্যালো সুফিয়া....হ্যালো...

বলুন আব্বা, বলুন, হ্যালো...বলুন?

প্রত্যেকটা বাড়ীতে আনাচে-কানাচে, রান্নাঘরে, শোবার ঘরে খুঁজে দেখা হচ্ছে। হ্যালো সুফিয়া, আমাদের বাসায় তোমরা সাবধানে থাকবে....

সুফিয়া এবার বললো—ভয় নেই আব্বা, পুলিশ সুপারের বাড়ীতে দস্যু বনহুর আসতে সাহসী হবে না।

ওদিক থেকে শোনা গেলো মিঃ আহমদ সাহেবের কণ্ঠ—তুমি জানো না সুফিয়া, দস্যু বনহুর কত সাংঘাতিক!

সাবধানেই থাকবো, চিন্তা নেই। সুফিয়া রিসিভার রেখে দিলো।

বনহুর বললো—সুফিয়া, মিথ্যে কেন বললে? আমি তো এসেছি।

সুফিয়া বনহুরের দিকে তখন তাকিয়ে আছে। সুন্দর মুখ-মন্ডলে মলিন একটা ছাপ, ললাটের পাশে এক জায়গায় কেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে। চুলগুলো এলোমেলো—রুক্ষ, হাতে হাতকড়া, সমস্ত শরীরে শিকল জড়ানো।

এমন সময় বাইরে শোনা গেলো মিসেস সুপারের কণ্ঠস্বর—সুফিয়া!

সুফিয়া চমকে উঠলো, তাড়াতাড়ি বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো—ভাইয়া, আপনি শীঘ্র বাথরুমে প্রবেশ করুন, আম্মা এদিকে আসছেন।

বনহুর সুফিয়ার কথায় দ্রুত বাথরুমে প্রবেশ করলো।

পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করলেন মিসেস আহমদ, কন্যাকে লক্ষ্য করে বললেন—এখানে কার যেন কথা শুনলাম সুফিয়া?

কই, নাতো? আমিই পড়ছিলাম।

আমার যেন মনে হলো কোনো পুরুষ-কণ্ঠ?

পুরুষ-কণ্ঠ! আমার ঘরে! ...কি যে বলো আম্মা? সত্যি তুমি দিন দিন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছো। আমার ঘরে পুরুষ আসবে কোথা থেকে!

কি জানি, তবে ওদিকে বোধ হয় রাজু কথা বললো। যাই দেখি রাজু বাজার নিয়ে বোধ হয় ফিরেছে।

রাজু পুলিশ-সুপার আহমদ সাহেবের বিশ্বাসী চাকর। যত দাস-দাসীই থাক বেগম সাহেবা রাজুকে ছাড়া কারও হাতে বাজারের টাকা দেবেন না। রাজুর বাজার নাকি সবচেয়ে তাঁর মনপুতঃ হয়। বাসায় বেশ সংখ্যক চাকর-বাকর থাকা সত্ত্বেও সুপার গৃহিণীর অভ্যাস—নিজ হাতে তরকারিটুকু কুটবেন, রান্নার সময় বাবুর্চির পাশে দাঁড়িয়ে রান্নাটা দেখবেন। কোনো কোনো দিন সখ করে তিনি নিজেও উনানের পাশে মোড়টা নিয়ে নিজ হাতে রান্না করবেন এসব তাঁর অভ্যাস।

তাই রাজু যখন বাজার থেকে ফেরে তখন বেগম সাহেবা যেখানেই থাকুন না কেন, হাজির হবেন রান্না ঘরের দরজায়। অসুখ-বিসুখ হলেও তাঁর স্বস্তি নেই, চাদর মুড়ি দিয়ে এসে বসবেন মোড়াটা টেনে নিয়ে। রাহেলার মা ঝিঙ্গ—কুটতে পারে ভালো, বেগম সাহেবা নিজে না পারলে ওকে দিয়েই কুটিয়ে নেন। ওটা এমনি করে কাটো, ওটা বেশী বড়ো করিসনে হঠাৎ যদি কোনোটা ভুল করে বসে তবে সুপার গৃহিণী রেগে আগুন হন, বলেন—নাঃ তোদের দিয়ে কিছু হবে না, যত সব অকেজো। দে বটিটা, আমাকে দে দেখি, আমিই কুটছি।

রাহেলার মা অতি সাবধানে বেগুনটা বা আলুটা কাটছিলো কিংবা মাছের টুকরো করছিলো, বেগম সাহেবার বিরক্তিপূর্ণ কথাতে তাড়াতাড়ি বটি ছেড়ে দিয়ে সরে বসতো।

বেগম সাহেবা তরকারি কাটতে কাটতে বলতেন—দেখ্ একটু শিখে নে, দু'দিন অসুখে পড়ে থাকলে যেন তরকারিটা অন্ততঃ কাটতে পারিস। সুপার-গৃহিণীর সংসারে প্রতি অত্যন্ত মোহ, কাজেই সবকিছু তিনি নেজে দেখাশুনা করিয়ে নেন।

আজও রাজুকে বাজারে পাঠিয়ে বেগম সাহেবা প্রতীক্ষা করছিলেন কখন ফিরবে সে। স্বামী সেই সাত সকালে এক কাপ চা মুখে দিয়ে বেরিয়ে

পড়েছেন। আজ দস্যু বনহুরের মৃত্যুদন্ড, কাজেই সারাটা দিন তিনি ব্যস্ত থাকবেন। কখন ফিরবেন ঠিক নেই।

এই বেলাটুকুর মধ্যে কতবার যে বেগম সাহেবা দস্যু বনহুরকে বদদোয়া করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। দস্যু বনহুরের জন্য আজ তাঁর স্বামীকে রাত ভোর না হতেই ছুটতে হয়েছে অফিসে। কখন ফিরবেন না ফিরবেন তারও ঠিক নেই। শুধু কি আজই, এমনি অসময়ে ছুটতে হয়েছে বিশ্রাম ত্যাগ করে। তাই সুপার-পত্নীর যত রাগ ঐ দস্যু বনহুরের উপরে।

অবশ্য সুফিয়া মাকে বলেছিলো বহুদিন, আম্মা, দস্যু বনহুরকে তুমি দেখতে পারো না কেন? সে না হলে আজ তোমার কন্যাকে ফিরে পেতে না জানো?

বেগম সাহেবা বলতেন, যত বড় দস্যুই হোক তোর আব্বার নাম শুনলে থরথর করে কাঁপে জানিস। তাঁর ভয়েই দস্যু বনহুর তোকে স-সম্মানে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেছে।

সুফিয়া হেসে বলতো, তুমি জানো না আম্মা, দস্যু কোনোদিন কাউকে ভয় করে না, আর সে তো দুঃসাহসী দস্যু বনহুর। বেশী কথা বলে মাকে বিরক্ত করতে চাইতো না সে, সরে যেতো আগলোছে।

আজ সকাল থেকে মা দস্যু বনহুরকে উদ্দেশ্য করে যখন গালমন্দ করছিলেন, নীরবে সরে থেকেছে সুফিয়া। মনের অবস্থা তার মোটেই ভাল নয়, কাজেই মায়ের সঙ্গে কথা বাড়াতে মন তার চাইতো না। চুপচাপ সরে ছিলো পড়ার ঘরে।

সুপার-গৃহিণী চলে যেতেই সুফিয়া বাথরুমের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, চাপাস্বরে ডাকলো—ভাইয়া!

বাইরে বেরিয়ে এলো বনহুর, বললো সে—সুফিয়া, আমাকে কতক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারবে, তার চেয়ে পুলিশের হাতেই তুলে দাও।

ভাইয়া আপনার ঋণ জীবনে পরিশোধ করতে পারবো না। আমার জীবন দিয়েও আপনাকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবো।

কিন্তু পারবে?

দৃঢ়কণ্ঠে বললো সুফিয়া—পারবো।

সুফিয়া বোন, কি করে তা সম্ভব হয়। তবে কোনোক্রমে রাত অবধি যদি আমাকে.....

আপনাকে এ অবস্থায় আমি ছেড়ে দিতে পারিনে ভাইয়া। শিকলে আপনার সমস্ত শরীর বাঁধা, হাতে হাতকড়া।

সুফিয়ার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো।

বনহুর বললো—উপায় কি বলো?

ভাইয়া, আপনার হাতকড়া খুলে দিলে আপনি....

সুফিয়াকে কথা শেষ করতে দেয় না বনহুর, বলে উঠে—হাত—কড়ার চাবি সংগ্রহ করতে পারবে সুফিয়া?

পারবো।

সত্যি?

হাঁ, আমি কৌশলে একটা হাতকড়া যোগাড় করে নেবো, নিশ্চয়ই সঙ্গে চাবি থাকবে। ভাইয়া,পুলিশ সুপারের মেয়ের একটা হাত কড়ার চাবি সংগ্রহ করতে বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু....

কিন্তু নয় সুফিয়া, তুমি আমার হাত দুটো মুক্ত করে দাও, তাহলেই দেহের শিকলের দিকে তাকিয়ে বললো বনহুর—এগুলো খুলে ফেলতে আমার বেশী সময় লাগবে না।

তাই দেবো ভাইয়া, আপনাকে মুক্ত করে দেবো।

সুফিয়া!

ভাইয়া, আপনি আমার শোবার ঘরে চলুন, এই তো ভিতর দিয়ে দরজা। চলুন কেউ আসবে না আমার ঘরে। আমার বিছানায় আপনি শুয়ে থাকুন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বললো বনহুর—সুফিয়া।

চলুন ভাইয়া।

সুফিয়া বনহুরকে সঙ্গে করে শোবার ঘরে প্রবেশ করলো। সুফিয়ার মা তখন সংসারের কাজকর্ম চাকর-বাকরগণকে দেখিয়ে দিতে ব্যস্ত।

সুফিয়ার কোনো ভাই-বোন ছিলো না, কাজেই তার ঘরে একমাত্র মা ছাড়া অন্য কেউ প্রবেশ করতো না। আর করতো রাহেলার মা। সে ঘর পরিস্কার করতো, ঘর গোছাতো সুফিয়ার বই-পত্তর গুছিয়ে রাখতো। চাকর বাকর অনেক থাকলেও সহসা কেউ সুফিয়ার কক্ষে যেতো না।

কাজেই বনহুরকে তার কক্ষে লুকিয়ে রাখতে তেমন কোনো কষ্ট হলো না। কিন্তু হঠাৎ যদি তার মা এসে পড়েন বা রাহেলার মা—তাহলে কি হবে, সুফিয়া একটু চিন্তিত হলো বইকি।

বনহুর সুফিয়ার কক্ষে প্রবেশ করে বললো—তোমার ঘরে আমার প্রবেশ অন্যায় সুফিয়া। তুমি পুলিশ সুপারের কন্যা। আর আমি একজন ঘৃণিত দস্যু।

না না ভাইয়া এ কথা আপনি বলবেন না, দস্যু হলেও আপনি মহান—আমার জীবন রক্ষাকারী।

সুফিয়া, তোমাদের বাড়ির চারপাশে পুলিশ পাহারায় নিযুক্ত রয়েছে, দরজায় রাইফেলধারী পুলিশ—আর একজন দস্যু তোমার কক্ষে।

দস্যু হলেও আপনি আমার ভাইয়া; আর আমি আপনার বোন। ভাইয়া, আপনি আমার বিছানায় শুয়ে বিশ্রাম করুন।

দস্যু বনহুর আর সুফিয়ার মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন তারা অত্যন্ত চাপা এবং নীচুস্বরে বলছিলো। কক্ষের বাইরে কেউ শুনতে পাচ্ছিলো না।

বনহুর সুফিয়ার বিছানায় বসলো।

সুফিয়া নিজ হাতে বনহুরের ললাটের রক্ত মুছে দিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। তারপর দরজার পাশে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো—রাহে্লার মা! রাহেলার মা!

যাই আপা....রাহেলার মায়ের কণ্ঠ শোনা গেলো।

অল্পক্ষণে রাহেলার মা এসে দাঁড়ালো—আপা আমায় ডাকছেন?

হাঁ, শোন্ এক কাপ চা আর কিছু গরম সিঙ্গারা নিয়ে আয়, এখনও কিছু নাস্তা করতে পারিনি তেমন করে। শোন এনে আমাকে বাইরে থেকে ডাকবি।

আজ নতুন নয়—সুফিয়া নিজের ঘরে কারও যাওয়া পছন্দ করতো না; বলতো তার পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটবে। সুফিয়া প্রায়ই শাসিয়ে দিতো রাহেলার মাকে—খবরদার, আমার ঘরে ঢুকবি নে।

তাই আজ সুফিয়ার কথায় কিছুমাত্র অবাক হলো না রাহেলার মা, অবাক হলো হঠাৎ অসময়ে চা-সিঙ্গরা খাবার জন্য এত আগ্রহ কেন সুফিয়ার। বললো সে—আচ্ছা, আসছি আপামণি।

চলে গেলো রাহেলার মা।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রাহেলার মা গরম সিঙ্গরা আর চা নিয়ে দরজার পাশ থেকে ডাকলো—আপামনি, চা...সিঙ্গারা....

দড়বড় বেরিয়ে এলো সুফিয়া, রাহেলার মার হাত থেকে চা—সিঙ্গারার ট্রে নিয়ে চলে গেলো। ভিতরে—যাবার সময় বললো—নিজের কাজ করগে যা, আমি যখন ডাকবো তখন আসবি।

চলে যায় রাহেলার মা নিজের কাজে।

বেগম সাহেবা তরকারি কাটছিলেন, রাহেলার মাকে বললেন—দিয়ে এসেছিস বাছার চা আর সিঙ্গারা?

হাঁ; দিয়ে এলাম আম্মা।

বেশ করছিস বাছা মেয়েটা সময় মত খাবে না; হঠাৎ কখন সে কি খেতে ইচ্ছা করে ঠিক নেই। না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেলো। বেগম সাহেবা আপন মনেই বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন।

সুফিয়া বনহুরের সম্মুখে খাবার রেখে বললো—ভাইয়া একটু মুখে দিন।

সুফিয়া, আমার হাত দুটো বাধা, খাবো কি করে, শুধু একটু বিশ্রাম করতে দাও।

আমি খাইয়ে দিচ্ছি ভাইয়া।

সুফিয়া!

বোন ভাইকে খাইয়ে দেবে এতে আপত্তি কিসে? সুফিয়া নিজের হাতে বনহুরের মুখে তুলে দিতে লাগলো।

সত্যই বনহুর অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলো সুফিয়ার হাতে খেতে তার আপত্তি রইলো না।

এদিকে পুলিশ সুপারের কন্যাহস্তে দস্যু বনহুর যখন খাবার খাচ্ছিলো তখন পুলিশ সুপার দস্যু বনহুরের সন্ধানে পুলিশ ফোর্সদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন—একটা লোক যেন শহরের বাইরে যেতে না পারে কোন যানবাহনও নয়। শহরের প্রত্যেকটা রাস্তায় কড়া পাহারা থাকবে পুলিশ-সুপারের নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ দল কাজ করতে লাগলো।

আজ গোটা দিন ধরে স্বস্তি নেই কারও।

পুলিশ সুপার থেকে শুরু করে পুলিশ-গার্ড পর্যন্ত।

কোথায় আজ দস্যু বনহুরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে দেশবাসী নিশ্চিন্ত হবে, আর হলো কি।

কথাটা অল্পক্ষণের মধ্যেই সমস্ত শহরে প্রচারিত হলো। রেডিও অফিস থেকে বললেন পুলিশ সুপারের জরুরী ঘোষণা।

সুফিয়ার টেবিলে রেডিওতে একটা পল্লীগীতি হচ্ছিলো, সুফিয়া যখন বনহুরের মুখে চায়ের কাপ তুলে ধরলো ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেলো পুলিশ সুপারের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর, "পুলিশ বাহিনীর যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর পুলিশ ভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে বিপুল জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। শহরের যে কোন গোপন স্থানে সে এখন আত্মগোপন করে আছে। আজ তার মৃত্যুদণ্ডের তারিখ ছিলো। তাকে হাঙ্গেরী কারাগার থেকে জম্বুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো, কিন্তু আমাদের পুলিশ বাহিনীর সমস্ত সতর্কতা ভেদ করে দস্যু পালিয়েছে।"

বনহুর সুফিয়ার মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে রইলো।

সুফিয়া বললো—আব্বার গলা এটা।

বনহুর নির্বাক হয়ে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে তখনও তাকিয়ে আছে সুফিয়ার মুখে।

❑

মনিরা অন্ধ।

শুধু অন্ধই নয়, অসুস্থ। আজ স্বামীর মৃত্যুদন্ড দিবস।

মনিরা খাটের সঙ্গে মাথা আছড়ে কাঁদছিলো, ভোর থেকে এখন পর্যন্ত এক মুহূর্ত তার কান্না থামেনি। খাটে মাথা ঠুকে রক্ত বের করে ফেলেছে মনিরা, তবু মনে এতটুকু সান্ত্বনা পাচ্ছে না। মনিরার এ অবস্থা, বাড়ীর সকলেরই মনে শান্তি নেই। গোটা বাড়ীময় একটা করুণ ভাব ফুটে উঠেছে।

মরিময় বেগম আজ আর মনিরাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার পাশে বসে নাই, নিজের ঘরে জায়নামাজে বসে দু'হাত তুলে পুত্রের জন্য অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। মায়ের হৃদয় আজ গুমড়ে গুমড়ে কেঁদে উঠছে। সব ব্যথা এতদিন তিনি নীরবে সহ্য করে এসেছেন, এমন কি স্বামীর মৃত্যুও তাকে এতখানি বিচলিত করেনি। আজ মরিয়ম বেগম সমস্ত দুনিয়াকে অন্ধকার বিভীষিকাময় দেখছেন। পৃথিবীর সবাই যেন কাঁদছে আজ তাঁর সন্তানের জন্য। আকাশ বাতাস, বৃক্ষ-লতা-গুল্ম নদী, পাহাড়-পর্বত, সবাই যেন হাহাকার করছে, শুধু তার সন্তানের জন্য...................

পাশের ঘরে মনিরার কান্নায় প্রতিধ্বনিই মরিয়ম বেগমের হৃদয়ে এই ভাবের সৃষ্টি করে চলেছে। বেচারী মনিরা, কিইবা এমন বয়স হয়েছে—এই বয়সেই সংসারের সব ব্যথা তাকে হজম করতে হচ্ছে। শিশুকালে পিতা মাতাহারা আশ্রয়স্থল হিসেবে একমাত্র মামুজানকে পেলো সে। তাঁকেও হারালো অল্পদিনের মধ্যে। নারীর মাথার মণি স্বামী—আজ সেই স্বামীকেও বেচারী হারাতে চলেছে। তাই শুধু নয়, নিজের দৃষ্টিশক্তিও হারিয়েছে সে...

চৌধুরী বাড়ীর এই গুমোট ভাব দাসদাসীর মনে একটা অহেতুক চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবাই কিন্তু জানে না চৌধুরীবাড়ীর ভিতরের গোপন রহস্য। জানতেন সরকার সাহেব আর সামান্য একটু জানতো নকিব।

সরকার সাহেব আজকাল একেবারে হতভম্ব হয়ে পড়েছেন। চৌধুরী বাড়ির আনন্দে তাঁর আনন্দ, চৌধুরী বাড়ির দুঃখে তাঁর দুঃখ। আজ কতদিন হলো চৌধুরী বাড়ির আনন্দে ভাটা পড়েছে। কারও মুখে হাসি নেই, কারও মনে শান্তি নেই। সব সময় একটা বিমর্ষ থমথমে ভাব বাড়িটার সর্বত্র।

সরকার সাহেব চৌধুরী বাড়ির একজন হিতাকাঙ্ক্ষী, কাজেই তাঁর মনে যে দারুণ একটা অশান্তির করাল ছায়া আচ্ছন্ন থাকবে তাতে তার আশ্চর্য কি!

এই বাড়িতে একদিন কিনছিলো আর কি না হতো! সব সময় হলঘর গম্‌গম্‌ করতো আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধবে। চৌধুরী সাহেব ছিলেন সদা হাস্যালাপী মানুষ। একদন্ড লোকজন না হলে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠতেন। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই খানা-পিনা-পার্টি ও ফাংশন লেগেই থাকতো। শহরের বাড়িতে যত না হতো, তার চেয়ে অনেক বেশী হতো তাঁর দেশের বাড়ীতে। বছরান্তে সপরিবারে চৌধুরী সাহেব নৌকাযোগে দেশে যেতেন। যে ক'দিন দেশের বাড়িতে থাকতেন নানা রকম উৎসব আর আনন্দ চলতো।

এ গ্রাম, সে গ্রাম থেকে আত্মীয়কুটুম্ব এসে বাড়ী সরগরম হয়ে উঠতো। বন্ধুবান্ধবে মুখর হয়ে উঠতো বৈঠকখানা। মেয়ে মহলেও তেমনি ভীড় জমতো। যেখানে যে আত্মীয়া এসে জড়ো হতো সবাই চৌধুরী বাড়িতে। মরিয়ম বেগম বহুদিন পর তাঁর আত্মীয়দের পেয়ে অনেক খুশী হতেন। অভাব নেই কিছুর—রান্নার উঠানে রান্না চলেছে, গল্পের আসরে গল্প বৈঠকখানায় চৌধুরী সাহেব পুরুষদের নিয়ে মেতে থাকেন। খাবার সময় হলে ডাক পড়তো উঠানে। চৌধুরী সাহেব সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পরম আনন্দে ভোজন করতেন।

সরকার সাহেবের এসব কি ভুলবার! কোনোদিন তিনি এ বাড়ীর কারও বিষণ্ন মুখ দেখেননি, অবশ্য শিশু মনির হারিয়ে যাবার পর কিছুদিন চৌধুরী বাড়ির রূপ বদলে গিয়েছিলো সম্পূর্ণরূপে। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে চৌধুরী সাহেব এবং বেগম সাহেবা উন্মাদ প্রায় হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু সেও তো আজ পঁচিশ বছর আগের কথা।

পুত্রহারা চৌধুরী সাহেব তারপর নিজকে সুস্থির করে নিতে পেরেছিলেন অনেক কষ্টে। আল্লাহ যা করেন তাঁর উপর তো হাত বাড়াতে পারবেন না। তিনি নিজের অদৃষ্টের উপর বিশ্বাস রেখে সন্তানের স্মৃতি মুছে ফেলেছিলেন মন থেকে।

আবার তিনি পূর্বের ন্যায় হাসি-খুশীতে মুখর হয়ে উঠেছিলেন। বিশেষ করে মনিরাকে পেয়ে তিনি ভুলতে সক্ষম হয়েছিলেন প্রিয় পুত্র মনিরকে। কন্যা সমতুল্য মনিরা মামা-মামীর সমস্ত হৃদয় জয় করে নিতে পেরেছিলো।

মনিরার হাসি-খুশী মুখ সন্তানহারা স্বামী-স্ত্রীর মনে এনেছিলো এক অনাবিল আনন্দ। চঞ্চল শিশু মনিরা ধীরে ধীরে বড় হতে লাগলো, ভুলে গেলেন চৌধুরী সাহেব মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজ পুত্রের মুখ।

যদিও চির হাস্যময় চৌধুরী সাহেব পুত্রের অন্তর্ধানে একেবারে অসাড়ের মত স্তব্ধ হয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই ভাবগম্ভীর মুহূর্তগুলো বেশীদিন স্থায়ী হতে পারেনি, মনিরার উচ্ছল হাসি-খুশী আবার তাঁকে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক করে তুলেছিলো। অন্তরের ব্যথার আগুনে গুমড়ে আগুন মরলেও নিজেকে বেশীক্ষণ চিন্তাযুক্ত রাখতে পারেননি। মনিরাকে বুকে নিয়ে পুত্রস্মৃতি ভুলতে চেষ্টা করেছেন।

মরিয়ম বেগমও স্বামীর মনের কথা বুঝতেন কিন্তু কি করবেন যা গেছে তা কি আর ফিরে আসবে! তাই তিনিও স্বামীকে সান্ত্বনা দিতেন, নানা রকম প্রবোধ বাক্যে স্বামীর মনের ব্যথা মুছে ফেলতে চেষ্টা করতেন।

বছর গড়িয়ে যাচ্ছিলো, চৌধুরী বাড়ীর রূপ আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছিলো। আবার ভাবগম্ভীর চৌধুরী সাহেব আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব নিয়ে হলঘর সরগরম করে তুলতেন। মনিরাই তাঁদের এখন সব হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। মনিরাকে লেখাপড়া, গান-বাজনা শেখানো হয়ে উঠেছিলো চৌধুরী সাহেব ও তাঁর গৃহিণীর চরম লক্ষ্য। বছরে চৌধুরী বাড়িতে নানা রকম উৎসব লেগেই থাকতো। আজ মনিরার জন্ম উৎসব, কাল মনিরার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আনন্দ উৎসব, পরশু বান্ধবীদের নিয়ে পার্টি। তারপর চৌধুরী সাহেবের নিজস্ব ফাংশানের তো কথাই ছিলো না।

আজ সরকার সাহেব হলঘরে বসে এসব কথাই ভাবছিলেন। এতদিন তবু নানা কথায় সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে বেগম সাহেবা আর মনিরাকে প্রবোধ দিয়ে এসেছেন। যদিও তিনি জানতেন এ সব বলা তাঁর বৃথা, তবুও না বলে পারতেন না।

কিন্তু আজ তাঁর মুখে কোনো কথা সরছে না।

স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন স্থবিরের মত, সম্মুখে রেডিওটা খোলা, একটু পূর্বে খবর হয়ে গেছে, এখন পল্লীগীতি হচ্ছিলো।

সরকার সাহেবের কোনো দিকে খেয়াল নেই, তিনি নিশ্চুপ বসে শুনছিলেন, পল্লীগীতি নয় খবর। কিন্তু কখন যে খবর শেষ হয়ে গেছে সেদিকে খেয়াল নেই তাঁর।

হঠাৎ সরকার সাহেবের চিন্তাধারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। রেডিওতে শোনা যায় একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠের জরুরী ঘোষণা—"পুলিশ বাহিনীর যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও দস্যু বনহুর পুলিশভ্যান থেকে লাফিয়ে পড়ে বিপুল জনতার মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে"

এটুকু শুনেই সরকার সাহেবের মুখচোখ খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠলো, তিনি আর শুনবার ধৈর্য ধরতে পারলেন না, ছুটলেন সিড়ি বেয়ে উপরে—বেগম সাহেবা, বেগম সাহেবা—মা মনিরা, মা মনিরা—ও পালিয়েছে, ও পালিয়েছে......মনির পালিয়েছে.....

সরকার সাহেবের কলকণ্ঠ মরিয়ম বেগমের কানে পৌছতেই তিনি জায়নামাজ থেকে উঠে ছুটে চললেন সরকার সাহেবের দিকে।

মনিরার কানেও সরকার সাহেবের গলার আওয়াজ গিয়ে পৌঁছেছিলো। মনিরা অন্ধ—সে কথা নিজে ভুলে গেলো, উঠিপড়ি করে সেও এগুতে লাগলো।

মরিয়ম বেগমের চোখে অশ্রু মুখে হাসির ছটা, তিনি চিৎকার করে বলছেন আর ছুটছেন—আমার মনির পালিয়েছে? আমার মনির পালিয়েছে...

মনিরার দৃষ্টিশক্তি নেই। সে কানে শুনতে পাচ্ছে বটে—কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না। বার বার দেয়ালে টক্কর খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে, এগুচ্ছে, আবার হোচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছে, তবু মুখে দীপ্ত হাসির ছটা।

অপূর্ব সে মুহূর্ত, ওদিক থেকে সরকার সাহেব সিড়ি বেয়ে এগিয়ে আসছেন, ওঘর থেকে মরিয়ম বেগম ছুটে আসছেন, ওঘর থেকে মনিরা একবার উঠছে, একবার পড়ছে, আবার দেয়াল ধরে ধরে হাতড়ে এগুচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে সরকার সাহেব এসে দাঁড়ালেন দোতলার বারান্দায়। মরিয়ম বেগমও এসে সম্মুখে দাঁড়ালেন, চোখেমুখে তাঁর ফুটে উঠেছে দীপ্ত উচ্ছ্বাস।

সরকার সাহেব খুশীতে আত্মহারা হয়ে ব্যস্তকণ্ঠে বললেন—পালিয়েছে, বেগম সাহেবা ও পালিয়েছে।

কে...কে পালিয়েছে সরকার সাহেব, আমার মনির'?

হাঁ হাঁ বেগম সাহেবা....

মনিরা তাড়াতাড়ি আসতে আবার পড়ে গেলো হোচট খেয়ে। অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সে পালিয়েছে!

মরিয়ম বেগম দ্রুত মনিরাকে তুলে ধরলেন।

সরকার সাহেব বললে—আসুন, রেডিও ঘোষণা শুনুন—

মনিরার কক্ষে ছিলো একসেট রেডিও। যখন খুশী মনিরা রেডিও খুলে দিয়ে গান শুনতো খবর শুনতো। আজ ক'দিন সে রেডিও স্পর্শ করেনি।

মরিয়ম বেগম আর মনিরা সহ সরকার সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করলেন।

সরকার সাহেব দ্রুতহস্তে রেডিও চালু করে দিয়ে বললেন—শুনুন শুনুন বেগম সাহেবা। মনির শোনো মা, আমি বলেছিলাম—আমাদের ছোট সাহেবকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না.......

রেডিওতে তখনও পুলিশ-সুপারের গম্ভীর কণ্ঠের ঘোষণা চলেছে। তিনি জনগণকে বারবার দস্যু বনহুর সম্বন্ধে সাবধান হবার নির্দেশ দিচ্ছেন।

রেডিওর পাশে ঝুঁকে পড়লেন সরকার সাহেব, মরিয়ম বেগম আর মনিরা। তাঁদের নিশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। স্তব্ধ হয়ে শুনছেন তাঁরা পুলিশ-সুপারের সাবধান বাণী।

পুলিশ সুপারের কণ্ঠস্বর—"বিপুল জনতা তাকে দেখবার জন্য পথের ধারে এমনভাবে ভিড় করে"শেষ পর্যন্ত জনতা পুলিশ ভ্যানের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, যার জন্য দস্যু পালাতে সক্ষম হয়। পুলিশ কিছুতেই জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে সক্ষম হয়নি। দস্যু বনহুর যখন জনতার মধ্যে উধাও হলো তখন শুধুমাত্র জনতার জীবনহানির আশঙ্কায় পুলিশ গুলী ছোঁড়েনি। দস্যু বনহুরের হাতে এখনও হাতকড়া এবং তার শরীরে মজবুত করে শিকল আটকানো আছে। যে তাকে পুনঃ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হবে তাকে পঁচিশ হাজার টাকা বখশীস দেওয়া হবে। আমি আবার আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি আপনারা প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ীর সর্বত্র সর্তক দৃষ্টি রাখুন, দস্যু বনহুর আপনাদের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে.....

মনিরা দু'হাতে টেবিলের রেডিও চেপে ধরে আনন্দভরা কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি করে উঠলো—তুমি বেঁচে আছো! তুমি বেঁচো আছো--

মরিয়ম বেগম দু'হাত উপরে তুলে ধরে—হে পাক পারওয়ারদেগার, তুমি রহমানুর রাহিম, তোমার অসাধ্য কিছু নেই। আমার মনিরকে তুমি বাঁচিয়ে নাও, ওকে যে আমি তোমার দরগায় সঁপে দিয়েছি।

সরকার সাহেব চোখে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে বললেন—বেগম সাহেবা, ছোট সাহেবের কেউ অমঙ্গল করতে পারবে না। সে যে অতি উত্তম পুরুষ।

মনিরা অন্ধ হয়েছে তবু তার দুঃখ নেই ব্যথা নেই সে জন্য। আজ তার আনন্দ—মৃত্যুর কবল থেকে তার মনির উদ্ধার পেয়েছে।

মরিয়ম বেগম আবার গিয়ে জায়নামাজে বসলেন, খোদার কাছে পুত্রের মঙ্গল কামনা করতে লাগলেন। না জানি কোথায় কি অবস্থায় এখন সে আছে। যেখানেই থাকে ওকে তুমি রক্ষা করো দয়াময়। ওকে তুমি উদ্ধার করো..........

❑

বেলা বেড়ে আসছে, রহমান দলবল নিয়ে প্রতীক্ষা করছে—এই পথেই তাদের সর্দারকে নিয়ে পুলিশ ভ্যানগুলো আসবে। কিন্তু ঘন্টার পর ঘন্টা গড়িয়ে চললো। এতক্ষণও কোনো সাড়াশব্দ নেই পুলিশ ভ্যানের।

নূরী সবচেয়ে বেশী ঘাবড়ে গেলো, রহমানকে লক্ষ্য করে বললো—রহমান, আমাদের এই আক্রমণ প্রস্তুতি পুলিশবাহিনী হয়তো জ্ঞাত হয়েছে। তাই তারা সাবধানতঃ অবলম্বন করে অন্য পথে জম্বুর কারাগারে গমন করেছে।

রহমান উদ্যত রাইফেল সোজা করে উঠে দাঁড়ালো—জম্বুর কারাগারে যাবার এই একমাত্র পথ। নিশ্চয়ই কোনো ঘটনা ঘটে গেছে।

নূরী বলে উঠলো—রহমান, আমার মন বলছে—হুরকে পুলিশ বাহিনী ধরে রাখতে পারেনি। রহমান, সে নিষ্পাপ, সে পবিত্রতাকে কেউ জঘন্যভাবে হত্যা করতে সক্ষম হবে না—

রহমান বলে ওঠে—নূরী, আইনের কাছে নিষ্পাপ বা পবিত্রতার প্রশ্ন কোনো কাজ করে না। সর্দারকে ওরা আইনের চোখে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করেছে। পুলিশ কিছুতেই তাদের আইন ভঙ্গ করবে না।

কিন্তু আমার মন বলছে—তাকে ওরা মৃত্যুদন্ড দিতে সক্ষম হবে না।

সাবাস নূরী, খোদার কাছে এই প্রার্থনাই করো আমরা যেন সর্দারকে উদ্ধার করতে পারি—

রহমানের কথা শেষ হয় না,একটা পুলিশ ভ্যান দ্রুত এগিয়ে আসছে এদিকে দেখতে পায় তারা।

পুলিশ ভ্যানখানা অত্যন্ত বেগে এগিয়ে আসছে।

যেখানে সে অনুচর আত্মগোপন করেছিলো সবাই রাইফেল বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে নেয়।

রহমান আর নূরী পাশাপাশি দুটো টিলার পাশে ছিলো। উভয়ের হাতেই গুলীভরা রাইফেল। রহমান চোখে দুরবীণ লাগিয়ে দেখছিলো, বললো সে—মাত্র একটা পুলিশ ভ্যান দেখতে পাচ্ছি।

নূরী বললো এবার তাহলে হুরকে এটাই আনছে নাকি?

রহমান হাসলো—এ বড় দুঃসাহস হবে পুলিশ বাহিনীর। দস্যু বনহুরকে একটি মাত্র পুলিশ ভ্যানে করে আনবে তারা অন্য কারাগারে?

দাও দূরবীণটা আমাকে দাও দেখি। নূরী রহমানের হাত থেকে দূরবীন নিয়ে টিলার পাশে উবু হয়ে শুয়ে পড়ে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই দেখতে পায়—ঐ ভ্যানে শুধুমাত্র কয়েকজন পুলিশ —হাতে রাইফেল সবাই এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। না তার হুর নেই ওর মধ্যে।

নূরীর মনে সান্ত্বনা আসে, দূরবীণটা ফিরিয়ে দিয়ে বলে—এরা তাহলে এভাবে আসছে কেন?

দূরে ভ্যানটা পথের বাঁক ঘুরে ফিরে এগিয়ে আসছে।

রহমান বললো—কেমন করে বলবো বলো?

অন্যান্য দস্যু বাঁশী ফুঁকিয়ে সজাগ হয়ে নিলো।

রহমান ক্ষান্ত থাকবার ইংগিতে বাঁশীতে শব্দ করলো।

কাজেই অন্যান্য দস্যু কেউ আর গুলী ছুঁড়বার জন্য প্রস্তুত হলো না।

রহমান তাড়াতাড়ি একটা বড় টিলার আড়ালে গিয়ে নিজের দস্যু ড্রেস পালটে অন্ধ ভিখারী সেজে নিলো তারপর বললো—নূরী, আমি এদের কাছে খবর নিয়ে আসি, সর্দার কোথায়।

নূরী বললো—ওরা যেভাবে এগিয়ে আসছে তাতে তোমার মত ভিখারীর সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে কথা বলবে বলে মনে হয় না।

তুমি চুপ করে দেখো নূরী। নিশ্চয়ই কোনো অঘটন ঘটেছে বলে আমার মনে হচ্ছে। নইলে একখানা পুলিশ ভ্যান এমন দ্রুত গতিতে জম্বু অভিমুখে ছুটতো না।

রহমান ছোট ছোট টিলা আর ঝোপঝাড় পেরিয়ে ছুটতে থাকে গাড়ি এতদূর এসে পড়বার পূর্বেই তাকে পথে পৌছতে হবে।

রহমান অত্যন্ত দ্রুত কাজ করলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই পথে এসে দাঁড়ালো। দ্রুত হস্তে কাঁধের ঝোলা থেকে কতকগুলো লোহার কাঁটা বের করে পথের ধুলোর মধ্যেই লুকিয়ে সোজা করে রাখলো। তারপর সেই স্থান হতে অনেক দূরে সরে গিয়ে খুড়িয়ে চলতে লাগলো আর বলতে লাগলো সে—আল্লা একটা পয়সা দে। আল্লা একটা পয়সা দে---

এদিকে পুলিশ ভ্যানটা দ্রুত এসে পড়লো সেই স্থানে।

হঠাৎ পেছনের চাকার হাওয়া বেরিয়ে গেলো পুলিশ ভ্যানটার।

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেমে গেলো।

পুলিশ ফোর্স গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তাদের কাছে পৃথক চাকা ছিলো, চাকা লাগানো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সবাই— সকলেরই চোখেমুখে ব্যস্ততার ছাপ।

এগিয়ে আসে ভিখারী, হাত পাতে পুলিশদের সামনে—আল্লা একটা পয়সা দে। আল্লা একটা পয়সা দে---

একজন পুলিশ ধমক দিলো—ভাগ্ এখান থেকে, বেটা আমরা জ্বালায় বাঁচছি না, একটা পয়সা—মুখ ভেংচে বললো সে।

ভিখারী আবার হাত পাতলো—আর একজনের সামনে—একটা পয়সা দে—একটা পয়সা------

অন্য একজন পুলিশ বললো—বেচারা খোঁড়া ভিখারী, দিয়ে দাও একটা আনা। এই এদিকে আয়, নে। পুলিশটার প্রাণে দয়া আছে, পকেট থেকে একটা আনি বের করে ভিখারীর হাতে দিলো।

ভিখারী হাত উচু করে দোয়া করলো, তারপর বললো—বাবু তোমরা কোথায় যাবে।

যে পুলিশটা পয়সা দিয়েছিলো সেই বললো—দস্যু বনহুরের নাম শুনেছিস বুড়ো?

দস্যু বনহুর! হাঁ শুনেছি বাবা, তাকেই ধরতে যাচ্ছো বুঝি?

দস্যু বনহুর পালিয়েছে, তাই জম্বুতে খবর দিতে যাচ্ছি আমরা।

দস্যু বনহুর পালিয়েছে? এত জোয়ান জোয়ান লোক তোমরা অথচ একজনকে ধরে রাখতে পারলে না? আল্লা একটা পয়সা দে-- একটা পয়সা দে-- ভিখারী চলে গেলো বিপরীত দিকে।

ততক্ষণে গাড়ির চাকা পাল্টানো হয়ে গিয়েছিলো, পুলিশগণ গাড়ীতে উঠে বসে স্টার্ট দিলো।

রহমান ছুটলো তার দলবলের নিকটে।

রহমানকে খুশীতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ছুটে আসতে দেখে তার দল বল সবাই তাকে ঘিরে ধরে।

নূরী ব্যস্তকণ্ঠে বলে ওঠে—রহমান খবর কি রহমান?

রহমান আনন্দধ্বনি করে ওঠে—নূরী তোমার কথাই সত্য হলো! সর্দার পুলিশের হাত থেকে পালিয়েছে।

রহমান!

হাঁ নূরী, সত্য। সেই সংবাদ নিয়েই পুলিশ ভ্যানটি জম্বুর পথে যাচ্ছে।

আমি জানতাম ওকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারবে না। কেউ ওকে হত্যা করতে সক্ষম হবে না। আর কি সংবাদ রহমান? এখন আমার হুর কোথায়? কেমন আছে সে?

পাগলী, সে সংবাদ আমি কি করে জানবো?

রহমান বাঁশীর শব্দে সমস্ত অনুচরগণকে একত্রিত করলো। তারপর তাদের সর্দারের সংবাদ জানালো।

সবাইকে ডেকে একটা সভা করলো।

রহমান সুউচ্চ একটা পাথরের উপরে দাঁড়িয়ে অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো—ভাইরা সর্দার আমাদের রক্তক্ষয় হতে রক্ষা করলেন। তিনি নিজকে বাঁচিয়ে নিয়েছেন পুলিশের হাত থেকে। কিন্তু তিনি এখন কোথায় কিভাবে আছেন আমরা কিছু জানি না। পুলিশদের নিকটে শুধু এই টুকুই জানতে পেরেছি—দস্যু বনহুর পালিয়েছে।

অনুচরগণ আনন্দধ্বনি করে উঠলো।

তাদের সংঘবদ্ধ কণ্ঠস্বর প্রকম্পিত হয়ে উঠলো বনাঞ্চল।

রহমান বললো এবার—ভাইগণ, আমরা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নই, যতক্ষণ না সর্দার আস্তানায় ফিরে এসেছেন। কাজেই আমাদের কাজ এখন অনেক বাকী। এই দন্ডে আমরা কয়েকজন ছদ্মবেশে শহরে প্রবেশ করবো। গোপনে অনুসন্ধান করতে হবে—কোথায় কিভাবে আছেন তিনি। নিশ্চয়ই পুলিবাহিনী সমস্ত শহরটাকে কড়া পাহারায় রেখেছে , আমাদের অতি সাবধানে কাজ করতে হবে। এখন আমাদের সবচেয়ে বড় চিন্তা—শহরে প্রবেশ করা কঠিন হবে। একটু নিশ্চুপ থেকে কি যেন ভাবলো রহমান, তারপর বললো—যে পুলিশ ফোর্স অল্পক্ষণ পূর্বে জম্বু অভিমুখে চলে গেলো তারা নিশ্চয়ই ফিরে আসবে এবং এই পথেই আসবে।

নূরীর চোখ উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো, আনন্দসূচক কণ্ঠে বললো সে—ঠিক বলেছো রহমান, ঐ সুযোগেই একমাত্র পথ শহরে প্রবেশ করবার।

হাঁ, পুলিশ ভ্যানটাকে আটকাতে হবে এবং গাড়ীতে যে ক'জন পুলিশ ছিলো তাদের সাবধানে আটকে রাখতে হবে। তাদের পোষাকগুলো এবং ভ্যানটা হলেই আমাদের চলবে।

নূরী বললো—সাবাস বুদ্ধি তোমার রহমান।

মুখ গম্ভীর করে ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো রহমান—কই আর বুদ্ধি খাটাতে পারলাম। সর্দারকে জান দিয়ে উদ্ধার করতে পারলে নিজকে ধন্য মনে করতাম, কিন্তু সর্দার সে সুযোগ আমাদের দিলেন কই। একটু চুপ করে থেকে বললো রহমান—এবার আমাদের কিছু সংখ্যক অনুচরকে কান্দাই প্রবেশ পথে পাহাড়িয়া অঞ্চলে আত্মগোপন করে থাকতে হবে, যতক্ষণ না ঐ পুলিশভ্যানটা ফিরে আসে। তারপর নূরীর দিকে তাকিয়ে বললো—নূরী তুমি বহুক্ষণ আমাদের সঙ্গে রয়েছো, তোমার মনি বড় পেরেশান হয়ে পড়েছে, যাও এবার তোমার ছুটি।

নূরীর মনে মনির কথা উদয় হতেই চিন্তিত হলো। অশ্বযোগে সোজা সে আস্তানায় ফিরে নিজের কক্ষে প্রবেশ করে পুরুষ ড্রেস পাল্টে নিলো। তারপর এগিয়ে চললো যেখানে নাসরিন আর জোবাইদা মনিকে নিয়ে খেলা করছিলো সেখানে।

নূরী নিকটবর্তী হতেই তার কানে এলো মনির কণ্ঠস্বর—বলো না, আমার বাপি কোথায়? বলোনা নাসু, আমার বাপি কোথায়? কোথায় গেছে সে?

মনি নাসরিনকে নাসু বলে ডাকতো, এটা অবশ্য নূরীর শেখানো বুলি। আর জোবাইদাকে জুবি বলতো মনি। নূরী নিজেই সঙ্গিনীদের আদার করে এই নামে ডাকতো। আম্মির মুখে শুনে শুনে মনিরও অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো ঐ নাম দুটো।

মনির কথা শুনে আড়ালে লুকিয়ে পড়লো নূরী।

মনি যদিও কথাটা নাসুকে জিজ্ঞাসা করলো কিন্তু জবাব দিলো জোবাইদা—তোমার বাপি কে মনি? যাকে তুমি বাপ বলে ডাকো, তিনিতো আমাদের সর্দার।

আমার বাপি তো তোমাদের সর্দার।

হেসে বললো জোবাইদা—তোমার আম্মির এখনো বিয়েই হয়নি।

আম্মির বিয়ে হয়নি?

না।

বিয়ে কেমন বলোনা জুবি?

তোমার আম্মিকে জিজ্ঞেস করো।

নূরী আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে এসব কি হচ্ছে?

একসঙ্গে মুখ টিপে হাসে নাসরিন আর জোবাইদা।

মনি কিছু বুঝতে না পেরে একবার তার আম্মির একবার নাসরিন আর জোবাইদার মুখে তাকায়।

নূরী অভিমানে মুখ ভার করে মনিকে তুলে নেয় কোলে, তারপর নিজের ঘরে চলে যায়।

কানের কাছে জোবাইদা আর নাসরিনের কথাগুলোর প্রতিধ্বনি হতে থাকে। জোবাইদার কণ্ঠ -- তোমার আম্মির বিয়েই হয়নি, বাপি পাবে কোথায় মনি তোমার আম্মির বিয়ে হয়নি, তোমার আম্মির বিয়েই হয়নি।

নূরী মনিকে বুকে চেপে ধরে অস্ফুট কণ্ঠে বলে—না না, বিয়ে আমার হয়ে গেছে--বিয়ে আমার হয়ে গেছে--হুর আমার স্বামী।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে জোবাইদা আর নাসরিন।

জোবাইদা বলে—নূরী, তুমি যা বলছো তা সম্পূর্ণ নিছক ভিত্তি হীন। নূরী, আমরা তোমার সঙ্গিনী, শিশুকাল হতে একসঙ্গে খেলাধূলো করে আজ এত বড় হয়েছি! আগে ছোট ছিলাম, তুমিও ছিলে, খেয়ালের বশে যা করেছো বা আমরা করেছি তা তেমন কোনো দোষণীয় নয় কিন্তু আজ আমরা বড় হয়েছি, তুমিও হয়েছো। সব বুঝতে শিখেছো জানো মুসলমান হলে কলেমা না পড়ে কোনোদিন বিয়ে হয় না। সর্দার তোমাকে বিয়ে করেনি, কলেমা পাঠ করে তোমাকে বিয়ে করেনি---

নূরী ফিরে তাকালো জোবাইদার দিকে, চোখে তার ক্রুদ্ধ ভাব ফুটে উঠেছে।

নাসরিন নূরীর কোল থেকে মনিকে নিজের কোলে নিয়ে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

ছোটবেলা থেকেই নাসরিন নূরীর অত্যন্ত প্রিয়, দু'জনের মধ্যে ভাবও অত্যন্ত বেশী। জোবাইদার সঙ্গেও নূরীর ভাব কম নয় তবে জোবাইদা একটু স্পষ্টভাষী। কাউকে কোনো কথা বলতে তার মুখ আটকায় না। ন্যায় কথা বলতে কাউকে সে পরওয়া করে না।

নাসরিন বুঝতে পারলো, দুই সখীর মধ্যে এখন তর্ক—বিতর্ক শুরু হবে, ছোট বেলা হলে কিল চড়ও হতো অনেক। অবশ্য এখন আর সে সব হয় না, শুধু কথা কাটাকাটি চলে।

সর্দারের সঙ্গে নূরীর মেলামেশাটা শুধু জোবাইদার নয়, আস্তানার অনেকের চোখেই বাধতো। দস্যু হলেও তারা মানুষ, কাজেই নিয়মের ব্যতিক্রম সবার কাছেই দৃষ্টিকটু মনে হয়।

সর্দারের সঙ্গে ব্যাপারটা—কাজেই মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে সাহসী হতো না।

তাছাড়া অনুচরগণ সবাই জানতো তাদের সর্দার সম্পূর্ণ উদাসীন এ ব্যাপারে। নূরীকে যতদূর সম্ভব বনহুর এড়িয়ে চলে—এটা সবাই ভালভাবে লক্ষ্য করেছে। সর্দারকে তারা দোষ দিতে পারে না, বরং তাকে অন্তরে অনুচরগণ গভীরভাবে শ্রদ্ধা করে।

শ্রদ্ধা করলেও নূরীর সঙ্গে সর্দারের মেলামেশা নিয়ে দু'চারটা গোপন আলোচনা যে চলে না, তা নয়।

এতদিন সবাই জানতো—সর্দার নূরীকেই বিয়ে করবে। এমন কি নাসরিন জোবাইদা ও তাদের বৃদ্ধা দাইমা জহুরাও সেই রকম মনে করতো, কাজেই তারা কোনো দিন এ ব্যাপারে তেমন কিছু বলেনি, কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা তারা সামান্য বলে অবহেলা করতে পারে না। সর্দারের দিক দিয়ে

তাদের বলবার কিছু খুঁজে না পেলেও নূরীর দিকটা সকলের মনে রেখাপাত করতে শুরু করেছে।

সেদিন দাইমা শুয়ে শুয়ে বলেছিলো নাসরিন আর জোবাইদাকে—আমরা ডাকুর বেটি বটে কিন্তু ধর্ম ছাড়া নই। কালু খাঁ আমাকে এনেছিলো বনহুরকে মানুষ করবার জন্য হুসনাপুর গ্রাম থেকে। বয়স তখন আমার শেষ হয়ে গিয়েছিলো, চল্লিশেরও বেশী হবে, সেই থেকে আমি আছি এই আস্তানায়। কালু খাঁ ডাকাত ছিলো কিন্তু সে কোনো দিন পরস্ত্রীকে স্পর্শ করেনি। আর বনহুর তারই হাতে গড়া মানুষ, অথচ সে নূরীর সঙ্গে যা'তা ভাবে মিশছে— ধর্মে এটা সইবে না। আমার বাবাও ডাকু ছিলো. কিন্তু লম্পট ছিলো না।

নাসরিন আর জোবাইদা বৃদ্ধার কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো—তবেতো এটা ভারী অন্যায়। নাসরিন আর জোবাইদা এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছিলো অনেক।

সর্দার নূরীকে বিয়ে করবে, এই ভরসা নিয়েই এতদিন তারা কোনো কথা বলেনি, কিন্তু এখন তো নূরীর বয়স কম নয়। যৌবন তার কানায় কানায় ভরে উঠেছে সর্দার তবু তাকে বিয়ে করছে না, কারণ খুজে পায় না নাসরিন আর জোবাইদা।

আসলে বনহুর যে গোপনে মনিরাকে বিয়ে করেছিলো—এ কথা আস্তানায় বিশিষ্ট কয়েকজন অনুচর ছাড়া আর কেউ জানতো না। রহমান সবাইকে রীতি মতভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলো, এ কথা তারা ছাড়া আর কেউ যেন জানতে না পারে।

রহমানকেও তারা কম ভয় করতো না, দস্যু বনহুরের প্রথম অনুচর রতনের অন্তর্ধানের পর রহমানই সর্দারের দক্ষিণ হাত ছিলো। কাজেই রহমানের নির্দেশেও তাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটা অসম্ভব নয়।

দস্যু বনহুরের অনুচর হওয়া তাদের জীবনের বড় সম্পদ। তাছাড়া সর্দার তাদের সবদিকে সুবিধা করে দিয়েছিলো। অর্থের কোনো অভাব তারা জানতো না। প্রতিটি অনুচরের সুখ—সুবিধার দিকে ছিলো বনহুরের নিপুণ দৃষ্টি। কারও অসুখ হলে বনহুর নিজে তার পাশে বসে অসুখের বর্ণনা শুনে সেইমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতো। বছরে একমাস ছুটি হতো সবার যার যার নিজ দেশে ফিরে যেতো তখন তারা।

দেশের এই বেকার সমস্যার প্রাক্কালে এমন একটা সুযোগ হারাবার ভয় কার না আছে। তাছাড়াও মৃত্যুভয়ও রয়েছে বটে। দস্যু আস্তানায় যেমন অর্থের কোনো হিসেব নেই, তেমনি অপরাধ করলে মৃত্যুরও কোনো সময় নেই। দোষ করলে শাস্তি গ্রহণ করতেই হবে।

কাজেই তারা জানতো তাদের সর্দার বিবাহিতা। তারা নীরবেই থাকতো। আর যারা—যে অনুচরগণ আজও জানে তাদের সর্দার এখনও অবিবাহিত; তারা নূরী আর সর্দার সম্বন্ধে গোপনে দু'একটা কথা আলোচনা করতো অবশ্য সর্দারকে তারা ভালভাবেই জানে। সর্দারের সম্বন্ধে তাদের মধ্যে এতটুকু সন্দেহের ছোয়াচ নেই। কারণ তারা সবাই জানে তাদের সর্দার একজন দেব সমতুল্য মানুষ। ইতিপূর্বে অনুচরদের অনেকেই অন্য দস্যুর সহচর হিসেবে কাজ করেছে। তখন তারা দেখেছে তাদের দলপতি বা সর্দারের আসল রূপ। মদ তাড়ি ভাং পান করা ছাড়াও সর্দার নারীদের নিয়ে যাতা ছিনিমিনি খেলতো তাদের হাতে কোনো মেয়ে পড়লে ইজ্জত বলে কিছু থাকতো না। আর দস্যু বনহুর ঠিক তার বিপরীত দস্যু হলেও কোনো নেশা তার ছিলো না। জীবনে সে কোনেদিন মদ স্পর্শ করেনি তাড়ি ভাং বা ঐ ধরনের কোনো নেশাও তার নেই। বনহুর নারীদের সম্মান করে মা—বোনের মত।

যে দস্যুদলের সর্দার এমন, তার অনুচরগণ কোনোদিন জঘন্য হতে পারে না, দস্যু বনহুরের অনুচরদের মধ্যে অনেকেরই অবশ্য গোপনে এসব নেশা ছিলো কিন্তু প্রকাশ্যে তারা কোনোদিন সর্দারের সামনে এইসব ব্যবহার করতে সাহসী হতো না।

সেই সর্দারের চরিত্র নিয়ে অনুচরগণ কুৎসিত ইংগিত করবে— এ কখনও হতে পারে না। বরং অনুচরগণ সর্দারকে অন্তরে অন্তরে ধন্যবাদ জানাতো; নূরীর মত সর্বসুন্দরী চঞ্চলা মেয়েকে ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েও সর্দার তাকে এড়িয়ে চলে।

কিন্তু সর্দার তেমন করে না মিশলেও নূরী তো সর্দারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করে। এটাই অনেকের মনে দ্বন্দ্ব জাগিয়েছিলো। তবে প্রকাশ্যে কেউ কোনো কথা বলতে সাহসী হতো না।

সবাই ব্যাপারটা নিয়ে তেমন করে না ভাবলেও জোবাইদা চুপ থাকতে পারলো না। আজ সে বলেই বসলো নূরীকে সর্দারের সঙ্গে এভাবে মেশা তার অন্যায় শুধু নয়—পাপ।

নূরী তীব্রকণ্ঠে বললো—না, পাপ নয়। হুরের সঙ্গে বিয়ে আমার হয়ে গেছে অনেকদিন।

হাসলো জোবাইদা —এটা কল্পনার যুগ নয় নূরী। বনে বাস করলেও আমরা পৃথিবীর মানুষ। অসংযত ব্যাপার আমরা মেনে নিতে পারিনে। নূরী রাগতঃ গলায় বলে উঠলো— জোবাইদা, আমার মুখের উপর এতবড় কথা বলতে পারলি?

সব কিছুরই সীমা আছে, সর্দারকে বলো—তোমাদের বিয়ে হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

নূরী এবার আপনা আপনি নরম হয়ে এলো, ধীরে ধীরে জোবাইদার পাশে এসে দাঁড়ালো —জোবাইদা, এ কথা আমি অনেক দিন ভেবেছি, কিন্তু ওকে বলতে পারিনি। তাছাড়া ওর দিক থেকেও আমি তেমন কোনো সাড়া পাইনি কোনদিন। জোবাইদা, তুই বিশ্বাস কর হুরের মত মানুষ আর দ্বিতীয় জন নেই। তুই আমর শিশুকালের সাথী, সব তুই জানিস। তোকে বলতে আমার কোনো দ্বিধা নেই, বনহুরের সঙ্গে আমার অস্পৃশ্য কোনো কিছু ঘটেনি আজও। জোবাইদা আমি অনেক সময় নিজকে সংযত রাখতে পারিনি, নিজকে সঁপে দিয়েছি বনহুরের বাহুর মধ্যে কিন্তু তোকে কি করে বোঝাবো আমি—সে কত পবিত্র, কত নির্মল—নিষ্পাপ

নূরীর কথাগুলো এক একটা যেন জোবাইদার হৃদয়ে গেঁথে যাচ্ছিলো। চোখে—মুখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিলো সে নূরীর মুখের দিকে। নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছিলো কিনা বোঝা যাচ্ছিলো না।

আবার বললো নূরী মানুষ কোনোদিন ফেরেস্তা নয়। হুরও পুরুষ মানুষ—আমি তার মধ্যে পুরুষোচিত মনোভাব জেগে উঠতে দেখেছি, কিন্তু সে নিজকে তখন কঠিনভাবে সংযত করে রেখেছে। কোনোদিন দূর্বল হয়নি আমার কাছে পাষাণ দেবতার মতই সে অবিচার করেছে আমার উপর। জেবাইদা হুরের এই হৃদয়হীন আচারণে আমি ক্ষুদ্ধ হয়েছি কিন্তু পারিনি ওকে কিছু বলতে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি সব রাগ অভিমান দুঃখ বেদনা ভুলে গেছি। জোবাইদা আমি কি করে বলবো তোকে আমার মনের দুঃখ ব্যথার কথা।

জোবাইদা নূরীর হাত দু'খানা মুঠায় চেপে ধরলো—আমাকে মাফ করে দাও নূরী। না জেনে আমি তোমাকে রূঢ় কথা বলেছি।

❑

সুফিয়া নিজের পড়ার ঘরে বইয়ের সেলফের পেছনে কম্বল আর চাদর বিছিয়ে সুন্দর করে বিছানা তৈরী করে দিলো। বনহুরকে লক্ষ্য করে বললো সুফিয়া—ভাইয়া এবার আপনি এখানে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুন। এই কক্ষে অন্য কেউ প্রবেশ করে না, তাছাড়াও আমি দরজায় তালা আটকিয়ে রাখছি। যতক্ষণ আপনাকে মুক্ত করে দিতে না পারবো ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।

বনহুর সুফিয়ার তৈরী বিছানায় বসে পড়ে বললো—সুফিয়া, আমার জন্য তোমাকে না কোনো বিপদে পড়তে হয়।

না না, আমার জন্য আপনি মিছামিছি ভাবছেন ভাইয়া। ইনশাআল্লাহ আপনার বোন আপনাকে মুক্ত করতে সক্ষম হবে। আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যাবো এবং কৌশলে চাবি সংগ্রহ করবো।

কিন্তু এটা কি সম্ভব হবে সুফিয়া?

হবে, আমি যে কোনো উপায়ে চাবি জোগাড় করবোই--

বনহুর আর সুফিয়ার মধ্যে যখন কথাবার্তা হচ্ছিলো তখন গাড়ী বারান্দায় মোটরের হর্ন বেজে ওঠে

সুফিয়া বলে—ভাইয়া, আমার আব্বা এসেছেন।

সুফিয়া, তুমি যাও।

হাঁ, আমি যাচ্ছি, দরজায় তালা লাগিয়ে দিচ্ছি--সুফিয়া দ্রুতপদে পড়বার ঘর থেকে বেরিয়ে দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলো।

ততক্ষণে পুলিশ—সুপার কাওসার আহমদের গম্ভীর কণ্ঠস্বর শোনা যায় —সুফিয়া, সুফিয়া--

কাওসার আহমদ সাহেবের কন্যাকে ডাকা একটা স্বভাবে পরিণত হয়েছিলো। যখনই যেখান থেকে ফিরুন, হলঘরের বারান্দায় পা দিয়েই ডাকবেন—সুফিয়া, সুফিয়া কোথায় তুমি মা?

সুফিয়া জানতো তার আব্বা তাকে কত স্নেহ করেন কত ভালবাসেন। যেখানেই থাক, সুফিয়া আসতো পিতার পাশে। ঘরে প্রবেশ করলে নিজের হাতে জামাকাপড় খুলে নিয়ে স্লিপিং গাউনটা এগিয়ে দিতো সে। হেসে হেসে কথা বলতো পিতার সঙ্গে। নানা খবর সংগ্রহ করতো সুফিয়া তাঁর নিকট থেকে।

মিঃ আহমদ কন্যাকে কাছে পেলে মনে আনন্দ বোধ করতেন। কন্যার কাছে তিনি মুখর হয়ে উঠতেন ছোট্ট শিশুর মতই। মিসেস আহমদ রাশভারী মানুষ, স্বামীর সেবা বড় একটা করে উঠতে পারতেন না। বাড়িতে চাকর বাকর দাস দাসী তো আর কম নয় কাওসার আহমদ তার নিজের যত কাজ চাকর—বাকর আর গার্ডদের দিয়ে সমাধা করে নিতেন। অনিচ্ছা বা ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি স্ত্রীকে অযথা বিরক্ত করতেন না।

তারপর সুফিয়া বড় হয়ে পিতার সেবার ভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছেন। চাকর বাকর থাক্ তবু সুফিয়ার পিতা বাইরে যাবার সময় তাঁর জামা—কাপড় নিজ হাতে এগিয়ে দিতো, আবার ফিরে এলে খুলে নিতো। চা—নাস্তা নিজেই পরিবেশন করে খাওয়াতো পিতাকে। কন্যার হাতে স্বামীর সেবার দায়িত্বভার তুলে দিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন বেগম সাহেবা।

প্রতিদিনের স্বভাব অনুযায়ী আজও কাওসার আহমদ বাসায় ফিরে কন্যাকেই ডাকলেন।

ব্যস্তভাবে সুফিয়া এসে দাঁড়ালো পিতার সামনে—আব্বা, দস্যু বনহুরের সন্ধান পেয়েছো?

দস্যু বনহুর ফস্‌কে গেলে তাকে পাকড়াও করা অত সহজ নয় মা, অত সহজ নয়।

সুফিয়ার পড়বার ঘরের পাশেই ছিলো সুপারের বিশ্রামকক্ষ। পিতা—পুত্রীর আলাপ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো বনহুর। সে চুপচাপ দেয়ালে ঠেস দিয়ে শুনছিলো পুলিশ—সুপার ও সুফিয়ার কথা বার্তা।

পিতার কথায় বললো সুফিয়া—আব্বা, দস্যু বনহুর কি করে পালালো? শুনেছিলাম অগণিত পুলিশ ফোর্স পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাকে জম্বুর কারাগারে নিয়ে যাওয়া হবে?

মিঃ কাওসার আহমদ সোফায় হতাশভাবে বসে পড়ে বললেন—অগণিত পুলিশ ফোর্সের বেষ্টনী ভেদ করেই সে পালিয়েছে।

আশ্চর্য তো!

শুধু আশ্চর্যই নয় মা, কল্পনার অতীত।

আব্বা, তোমরা তো জানোই সে দুর্ধর্ষ। বেশ করে হাতে হাতকড়া পরিয়ে মজবুত করে বেধে ভ্যানে তুললেই পারতে?

সে কথা তোকে বলতে হবে মা। দক্ষ পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ আহমদ তাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন। তিনি স্বয়ং নিজের হেফাজতে পুলিশ পরিবেষ্টিত করে নিয়ে যাচ্ছিলেন। দস্যু বনহুরের হাতে শুধু হাতকড়াই নয় তার সমস্ত শরীর ছিলো লৌহশিকল দিয়ে তালাবদ্ধ।

সুফিয়া দু'চোখ ছানাবড়া। করে বলে—হাতে হাতকড়া শরীরে শিকল বাঁধা তবু কি করে পালালো দস্যু বনহুর?

জনতা। জনতাই তাকে পালাবার সুযোগ এনে দিয়েছে। দস্যু বনহুরকে যে পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো সে পথের দু'পাশে জনতা তাকে দেখবার জন্য এত ভীড় করেছিলো, সে কথা তোকে বলে বুঝাতে পারবো না মা।

এমন সময় সেই কক্ষে প্রবেশ করেন সুপার গৃহিনী। স্বামীকে লক্ষ্য করে বলেন—শুনলাম দস্যু বনহুর নাকি ভেগেছে।

হাঁ।

তা ভাগবে না। তোমাদের যেমন বুদ্ধি—হাতে হাতকড়া, পায়ে বেড়িয়া পরিয়ে দিয়েছিলে?

হাতে হাতকড়া পরানো ছিলো কিন্তু--সত্যি বলেছো বেগম, পায়ে বেড়ি না পরিয়ে মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছিলো।

পাশের ঘরে বনহুরের মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

সুফিয়ার কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। সে বুঝি চাবির চিন্তায় আছে।

পুনরায় শোনা গেলো পুলিশ সুপারের গলা—যে কারণে আমি দস্যু বনহুরের হাতকড়া ও তার শরীরে বাঁধা শিকলের তালার চাবি নিজের কাছে রেখেছিলাম।

সুফিয়ার আনন্দসূচক কণ্ঠস্বর—সত্যি আব্বা, চাবি তোমার কাছেই ছিলো। দস্যু বনহুর তাহলে চাবিবদ্ধ অবস্থায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাক নিশ্চিন্ত হলাম, চাবি তাহলে সে আর পাচ্ছে না। কোথায় রেখেছো আব্বা?

এই যে আমার পকেটেই রেখেছিলাম মা। মিঃ কাওসার আহমদ চাবি দুটো বের করে কন্যা আর স্ত্রীকে দেখালেন ভেবেছিলাম জম্বুর কারাগারে দস্যুর মৃতদেহ থেকে হাতকড়া আর শিকল খুলবার সময় এ দুটো চাবি কাজে লাগবে।

সুফিয়ার আর কোনো কথা শোনা যায় না।

বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সুফিয়ার বাসনা তাহলে পূর্ণ হবে। এক্ষণে সুফিয়া, পাশে থাকলে সে ওর হাত দুটো চেপে ধরে অন্তরের স্নেহ জানাতো।

শোনা গেলো বেগমের গলা দস্যুটা মরলে তবু দেশে শান্তি ফিরে আসতো।

সুফিয়ার চোখ দুটো মায়ের কথায় অশ্রুসজল হলো, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললো—ছি আম্মা, দস্যু তোমার কি অন্যায় করেছে? বরং সে তোমাদের যে উপকার করেছে তা জীবনে পরিশোধ করতে পারবে না।

মিসেস সুপার বলে ওঠেন—তুই জানিস নে সুফিয়া কেন সে তোকে ওভাবে উদ্ধার করে এনেছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো প্রচুর অর্থ পাবে। তোর আব্বা তাকে পুরস্কৃত করবেন---

আম্মা, দস্যু হলেও তার হৃদয় অত নীচু নয়। অর্থের লালসা তার মোটেই নেই, তাছাড়ার পুরস্কার বা প্রতিদান সে কারও কাছে চায় না।

সুফিয়া একটা দস্যুর হয়ে কথা বলা উচিত নয়। তোমার মা যা বলছেন সত্য। নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের কোনো উদ্দেশ্য ছিলো--

আব্বা, তুমিও ভুল করছো।

সুফিয়া ! রাগতঃ কণ্ঠস্বর পুলিশ সুপারের।

বনহুর পাশের ঘরে গম্ভীর হয়ে পড়ে সুফিয়ার ছেলে মানুষি কথাগুলো শুনে চিন্তিত হয় সে। ভাবে—কি দরকার এই মুহূর্তে সেই পুরোনো কথাগুলো তোলার বড্ড বোকামি হচ্ছে সুফিয়ার। এক্ষণে বনহুর সম্বন্ধে তারও নিন্দা করা উচিত ছিলো।

পরক্ষণেই শুনতে পেলো সুফিয়ার কণ্ঠ—তোমাদের কোনোরকম কৃতজ্ঞতাবোধ নেই। দস্যু হলেও সে মানুষ, অপরাধী সে হতে পারে কিন্তু সে আমার জীবন রক্ষাকারী--

সুযোগ পেলে সে-ই এখন ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। বললেন বেগম সাহেবা।

সুফিয়া, কিছু বলতে যাচ্ছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তে সুফিয়ার পড়ার ঘরে একটা কিছুর শব্দ হয়।

মিঃ কাওসার আহমদ বললেন—কিসের শব্দ হলো?

সুফিয়া তাড়াতাড়ি বললো—আমি দেখে আসি আব্বা।

বেগম সাহেবা বলে উঠলেন—ভালভাবে দেখো সুফিয়া। শেষে দস্যুটা না আমাদের বাসায় এসে লুকিয়ে পড়ে।

হাসলেন পুলিশ-সুপার—হাসালে বেগম, আমার বাসায় আসবে দস্যু বনহুর —এমন সাহস তার হবে---

সুফিয়া ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে।

একটু পরে ফিরে আসে সুফিয়া হেসে বলে—মিনি বিড়ালটা আমার বইয়ের সেল্‌ফ থেকে নিচে লাফিয়ে পড়েছে, তারই শব্দ হলো।

পুলিশ—সুপার বললেন—বোধ হয় ইদুঁর দেখেছে তোমার মিনি। হাঁ, আব্বা ঠিক বলেছো মিনি ইঁদুর ধরবে বলে ঐ ঘরে ঢুকেছে। আমি তালা আটকে রেখেছি-- তাড়াহুড়ো করে বললো সুফিয়া এবার—আব্বু দস্যুকে খুঁজতে খুঁজতে সব ভুলে গেছো। তোমার খাবার সময় চলে গেছে কখন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে সে—এখন বেলা চারটে, খেয়াল আছে?

বেগম সাহেবার এতক্ষণে যেন হুশ হলো—তাই তো সেই যে সাত সকালে একটু নাস্তা আর এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়েছিলেন । বাইরের জিনিস খাবার অভ্যাসও নেই তাঁর। বেগম সাহেবা হাঁকলেন—বাবুর্চি, টেবিলে সাহেবের খাবার দাও।

সুফিয়া পিতার কোটটা গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললো আম্মা, তুমি যাও একটু দেখোগে। আব্বার খাবারগুলো বাবুর্চিকে বলো যেন গরম করে দেয়।

তুই কোটটা আলমারীতে রেখে দে সুফিয়া। কথাটা বলে উঠে দাঁড়ালেন বেগম সাহেবা।

মিঃ কাওসার আহমদ বললেন—সাবধানে রেখো মা সুফিয়া, কোটের পকেটেই চাবি দুটো আছে কিন্তু।

আমাকে অত করে বুঝিয়ে বলতে হবে না আব্বা। তুমি খেতে যাও, আমি সব ঠিক করে রাখছি।

পুলিশ—সুপার এবং সুপার —গৃহিণী কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সুফিয়ার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো খুশিতে এমনভাবে সুযোগ এসে যাবে হঠাৎ তার হাতের কাছে ধারণাও করতে পারেনি সে। ভেবেছিলো—অফিসে গিয়ে কৌশলে চাবি সংগ্রহ করবে কিন্তু তাকে এত কিছু করতে হলো না।

ডাইনিং রুম থেকে ভেসে আসছে পিতার কণ্ঠস্বর খেতে খেতে মায়ের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন তিনি। এটাই সুবর্ণ সুযোগ। সুফিয়া এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে আলমারীতে উঠিয়ে রাখা কোটের পকেট থেকে চাবি দুটো দ্রুত হস্তে বের করে নেয়। তারপর লঘু পদক্ষেপে ফিরে আসে নিজের কামরায়। সুফিয়ার পড়বার ঘরের দরজা ছিলো তার শোবার ঘরের মধ্য দিয়ে সুফিয়া তালা খুলে প্রবেশ করে চাপা কণ্ঠে ডাকলো—ভাইয়া।

বনহুর একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলো। অবশ্য যতক্ষণ পুলিশ সুপার, বেগম সাহেবা ও সুফিয়া কথাবার্তা চলছিলো, ততক্ষণ কান পেতে সব শুনছিলো সে।

পুলিশ সুপার খেতে গেলেন তারপর সুফিয়া বেশ কিছুক্ষণ নীরব রয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো বনহুর, তাই একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলো সে। সুফিয়ার কণ্ঠস্বরে উঠে বসে সুফিয়া।

ভাইয়া, আমি চাবি এনেছি --কই দেখি হাতটা —সুফিয়া চট্ পট্ বনহুরের হাতের হাতকড়া খুলে ফেললো, তারপর দেহের শিকলের তালা খুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বনহুর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ কণ্ঠে বললো বোন সুফিয়া, তোমাকে কি বলে আমার অন্তরের আন্তরিকতা জানাবো ভেবে পাচ্ছিনে।

ভাইয়া, আপনাকে মুক্ত করতে পেরেছি—এর চেয়ে আনন্দ আমার আর কিছু নেই।

দস্যু বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এসেছিলো, বললো —সুফিয়া চিরদিন তোমার কথা স্মরণ থাকবে আমার।

সুফিয়া হাতকড়া আর লৌহশিকলটা অতি সাবধানে লুকিয়ে রাখলে নিজের বইয়ের সেলফের পেছনে। তারপর সে চাবি দুটো নিয়ে ফিরে গেলো পিতার কক্ষে। আলমারী খুলে চাবি দুটো কোটের পকেটে রেখে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

এমন সময় খাওয়া শেষ করে এলেন পুলিশ সুপার এবং বেগম সাহেবা।

সামান্য একটু বিশ্রাম করার পর এক্ষুনি আবার তাঁকে বেরুতে হবে।

সোফায় বসে সিগারেট অগ্নিসংযোগ করলেন পুলিশ সুপার।

বেগম সাহেবা আর একটা সোফায় নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বললেন—দেখো সাবধানে যেও, দস্যু বনহুর না কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসে। এমন জাদরেল দস্যু কোনোদিন দেখিনি বাবা।

পুলিশ জীবনেই এমন দস্যু দেখিনি, আজ আঠারো বছর আমার চাকরী হলো!

পাশের ঘরে যখন পুলিশ সুপার এবং পুলিশ সুপার —গৃহিণী দস্যু বনহুরকে নিয়ে আলাপ —আলোচনায় রত তখন সুফিয়ার পড়ার ঘরে দস্যু বনহুর পায়চারী করে চলেছে। সন্ধ্যা অবধি তাকে এই কক্ষে প্রতীক্ষা করতে হবে।

খোদার কাছে লাখো শুকরিয়া করলো বনহুর—কেমন করে তিনি তাকে বাঁচিয়ে নিলেন। আর অন্তরের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে আন্তরিক মোবারকবাদ জানালো সে সমস্ত দেশবাসীকে। আজ তাদের হৃদয়ের নিবিড় টানে তারা ছুটে গিয়েছিলো তাকে এক নজর দেখবে বলে। বিপুল জনতার কঠিন চাপে পুলিশ বাহিনী অতিষ্ঠ হয়ে না উঠলে আজ তার মুক্তির অন্য কোনো পথ ছিলো না। শত শত নাগরিকের আগ্রহভরা ব্যাকুল আঁখি ভেসে ওঠে বনহুরের চোখের সামনে। কিন্তু আনেকেই তাকে দেখতে পায়নি, সামান্য কিছু সংখ্যক জনতা তাকে দেখতে পেরেছ মাত্র। যারা তাকে দেখতে পায়নি তাদের জন্য ব্যথা অনুভব করে সে মনের কোণে।

অল্পক্ষণ পর পুলিশ সুপার বেরিয়ে গেলেন, অনেক কাজ এখনও তাঁর বাকি। দস্যু বনহুরকে পুনরায় গ্রেপ্তার না করা পর্যন্ত পুলিশ অফিসারদের স্বস্তি নেই। সমস্ত শহরময় একটা ভীতিকর ভাব বিরাজ করছে। রেডিও বারবার সাবধান বাণী ঘোষণা করছে। দস্যু বনহুর শহরের কোনো গোপন স্থানে আত্মগোপন করে আছে। তাকে যে কেহ গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলে এবং পুলিশের নিকটে ধরিয়ে দিতে পারলে তাকে উপযুক্ত পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।

❑

নাসির শাহ্ কোনো কাজে বোন জুলেখার চেম্বারে প্রবেশ করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো।

জুলেখা তার সহপাঠি ডক্টর হামিদকে বলছে—আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম মনিরার চোখে দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

হাঁ মিস জুলেখা আপনার নিকটে আপনার বান্ধবী সম্বন্ধে সব শোনার পর আমিও অনেক বই ঘেটেছি তাতে বোঝা গেলো—আপনার বান্ধবীর দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে।

ডক্টর, আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন তাহলে হয়তো বেচারী মনিরার জীবন ব্যর্থ নাও হতে পারে।

ডক্টর হামিদের কণ্ঠস্বর—আপনি আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন, আমি আপনার বান্ধবীর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে আনার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করবো।

ধন্যবাদ ডক্টর। জুলেখার কণ্ঠস্বর।

পরক্ষণেই জুতোর শব্দ শোনা যায়। বোধ হয় ডক্টর হামিদ জুলেখার নিকট বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসছেন।

তাড়াতাড়ি আড়ালে গা ঢাকা দিলো নাসির শাহ। জুলেখার বান্ধবী মনিরা অন্ধ হয়েছে। অবাক হয়ে কিছুক্ষণ ভাবলো সে—মনিরা—সেই মনিরা —একদিন যে মনিরাকে পাবার জন্য নাসির শাহ্ উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো। মনিরাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া তার পক্ষে কঠিন ছিলোনা কিছু, কিন্তু জুলেখাই সব পন্ড করে দিয়েছে। মুখের শিকার হাতছাড়া করে দিয়েছে। বোন হলে কি হবে—নাসির শাহ্ সেই থেকে জুলেখাকে কঠিন চোখে দেখতো। অবশ্য জুলেখাকে বুঝতে দিতো না সে কিছু কারণ জুলেখা তাদের সবার ছোট বোন।

নাসির শাহ জুলেখার কাছে ভিজে বিড়াল হয়ে থাকলেও জুলেখা চালাক মেয়ে ভাইয়ের মনের খবর সে জানতো। নিজ সহোদর হলে কি হবে, বিশ্বাস করতো না সে কোনো সময় তাকে।

নাসির শাহ মনিরাকে বিয়ে করার প্রস্তাবও করেছিলো জুলেখার কাছে। জুলেখা ক্রুদ্ধকণ্ঠে তিরস্কার করেছিলো তোমার মত লম্পটের হাতে মনিরার মত রত্ন শোভা পাবে না।

এরপর নাসির শাহ আর কোনদিন বোন জুলেখাকে এ সম্বন্ধে বলেনি। ভিতরে ভিতরে সে সব সময় জুলেখার প্রতি বিষাক্ত মনোভাব পোষণ করে এসেছে।

জুলেখার কথায় হতাশ হয়নি সেদিন নাসির শাহ। হতাশ হয়েছিলো যেদিন শুনেছিলো—দস্যু বনহুরের সঙ্গে মনিরার সম্বন্ধ আছে।

নাসির শাহ যেমন চরিত্রহীন কুৎসিতমনা মানুষ, ভীতুও ছিলো তেমনি। দস্যু বনহুরকে চোখে কোনোদিন না দেখলেও ভয় করতো তাকে ভীষণ। অবশ্য বেশ কিছুদিন আগের ব্যাপার এসব।

এখন আর নাসির শাহ আগের সেই দুর্বলমনা নাসির নেই। আগের চেয়ে এখন তার দুরন্তপনা অনেক বেড়ে গেছে। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনই তার পেশা আর নেশা মদ পান ও নারী।

সন্ধ্যার পর তার গোপন আস্তানায় মদ আর নারীর আমদানী চলে পুরো দমে।

নাসির শাহ্ তার শয়তান সহচর মদ আর নারীর মধ্যে ডুবে গেলো ধীরে ধীরে। মনিরার প্রতি আকর্ষণ কমে এলো অনেক শিয়াল ও দ্রাক্ষাফলের মতই হলো মনিরা আর তার সম্বন্ধ।

হঠাৎ আজ সেই মনিরার কথা তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করায় নতুন করে স্মরণ হলো মনিরাকে।

একটু পূর্বেই রেডিও ঘোষণা শুনেছে—দস্যু বনহুর পলাতক। নিশ্চয়ই সে এখন নিজের জীবন নিয়ে ত্রাহি ত্রাহি করছে। মনিরার সঙ্গে তার আর কোনো সম্বন্ধ নেই।

নাসির শাহর মাথায় দুষ্ট বুদ্ধির প্যাঁচ খেলে যায়। মনিরা এখন অন্ধ। সে গোপনে সন্ধান নিয়ে জেনেছিলো—দস্যু বনহুর নাকি রাত্রিকালে মনিরার সঙ্গে দেখা করে থাকে মনিরার কক্ষে।

কথাটা সে হাওয়ায় শোনার মতই শুনেছিলো একদিন, আজ সেই কথাই তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। জুলেখার চেম্বারে প্রবেশ না করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে তার গোপন আড্ডা অভিমুখে।

সঙ্গীদের নিয়ে চলে তার আলোচনা।

মনিরাকে এখন কৌশলে চুরি করে আনা অতি সহজ ব্যাপার। দৃষ্টিশক্তিহীন মনিরাকে বনহুরের রূপ ধরে বাড়ীর বাইরে আনতে হবে অদুরে অপেক্ষা করবে আমাদের গাড়ী ব্যাস তারপর আর মনিরার সন্ধান কে পায় দেখা যাবে।

নাসির শাহ্ যখন চৌধুরী বাড়ীতে প্রবেশ করে মনিরাকে চুরি করে নিয়ে ফিরে আসবে তখন যেন তারদলবল সবাই সাবধানে প্রতীক্ষা করে।

নাসির শাহ্ যেমন জঘন্য মনোবৃত্তির মানুষ ছিলো তেমন শয়তান ছিলো তার অনুচরবর্গ। নাসির শাহর ইংগিতে তারা যে কোনো কুকর্ম করতে কুণ্ঠিত হতো না।

নাসির শাহ্র মুখে নতুন একটা কুযুক্তি শুনে খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠলো তারা। কিভাবে মনিরাকে চুরি করা যায় এ নিয়ে নানাভাবে চললো তাদের মধ্যে আলোচনা।

শুধু আলাপ আলোচনা নিয়ে মশগুল থাকবার বান্দা নয় নাসির শাহ্র অনুচর ও দলবল। তারা রীতিমত মদ পান এবং নেশাও করলো ।

নানা রকম ফুর্তি গান বাজনায় গোটা বিকেলটা কাটিয়ে দিলো।

নাসির শাহ্র একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বললো—কাজটা কিন্তু যত সহজ মনে করছো ঠিক ততখানি সহজ নয়।

কেন? বললো নাসির শাহ।

সুচতুর বন্ধু বললো—চৌধুরী বাড়িতে প্রবেশ করবে কি করে?

নাসির শাহ হেসে বললো—সে চিন্তা করেই কাজে নামছি বন্ধু।

কিভাবে কার্য সিদ্ধি করবে মনস্থ করেছো চাঁদ?

নাসির শাহর সাঙ্গপাঙ্গ আর বন্ধুর দল কেউ কেউ তাকে ঠাট্টা করে চাঁদ বলে ডাকতো।

নাসির শাহ বন্ধুদের কথায় খুশী হতো কি রাগ করতো ঠিক বোঝা যেতো না। নিশ্চুপই থাকতো তখন সে।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললো নাসির শাহ—সব আমি মনের মধ্যে ঠিক করে রেখেছি বন্ধু। নাসির শাহ্ কাঁচা লোক নয়, বুঝেছো? একটা কুৎসিত হাসির রেখা তার মুখে ফুটে উঠে বিলীন হয়ে যায়।

ওদিকে জুলেখা যখন বান্ধবীর মঙ্গল চিন্তায় বিভোর এদিকে তার ভাই নাসির শাহ্ তখন কিভাবে তাকে নষ্ট চরিত্রা করবে এবং তাকে কিভাবে নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে আসবে সেই চিন্তায় মগ্ন। রাত বেড়ে আসে নাসির শাহ্র গুপ্ত পরামর্শ শেষ হয়। সবাই উঠে পড়ে।

কিন্তু মদের নেশায় সবাই ঢুলু ঢুলু।

❑

মনিরা আজ এক দন্ডের জন্যও রেডিওর সুইচ অফ করেনি। রেডিও আঁকড়ে ধরে বসে আছে সে। রেডিওই আজ যে তার এক মাত্র আপন জন, অতি ঘনিষ্ঠ এবং পরম বন্ধু। বুকের মধ্যে যেন একটা ঝড়ের তান্ডব চলেছে। না জানি কোন্ মুহূর্তে রেডিও ঘোষণা করবে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে। এই সংবাদ যেন তাকে শুনতে না হয়, মনিরা খোদার কাছে বারবার প্রার্থনা করছে।

সমস্ত দিন আজ মনিরা পানি বিন্দু মুখে করেনি। মরিয়ম বেগম অনেক সাধ্য সাধনা করেছেন—মা, খোদা ওর সহায়। তুই এবার কিছু মুখে দে—মা।

না, মামীমা, আমি এখন মুখে কিছুই দিতে পারবো না, যতক্ষণ না জানবো—সে নিশ্চিন্ত।

সেই সংবাদ তুই কেমন করে পাবি মা?

আমার মন বলবে। আমার মন বলবে মামীমা। ঐ যে শোনো শোনো মামীমা—এখন পুলিশ বাহিনী সমস্ত শহর চষে ফিরছে। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উপযুক্ত পুরস্কার ঘোষণা করছে।

রেডিও ঘোষণা তখন স্পীডে হচ্ছিলো।

মনিরার চোখে ফোটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। রেডিও আঁকড়ে ধরে কান পেতে শুনতে থাকে সে।

সমস্ত দিনটা কেটে গেলো।

দেয়াল ঘড়ি সন্ধ্যা সাতটা ঘোষণা করলো। মনিরা চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায়। সন্ধ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্য সে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে। এই রাতের প্রতীক্ষায় মনিরা অপেক্ষা করছে।

মনিরা বললো—মামীমা দেখো তো বাইরে সূর্যের আলো নিভে গেছে কি?

হাঁ মনিরা সূর্যের আলো বিদায় নিয়েছে।

অন্ধকার হয়নি এখনও?

তেমন করে হয়নি।

মামীমা, আজ পৃথিবীটা কি অন্ধকার হতে জানে না?

মরিয়ম বেগম কোনো জবাব দেন না মনিরার কথায়। তিনি বুঝতে পারেন মনিরা কেন বারবার আজ রাত্রির আগমন প্রতীক্ষা করছে। পুলিশের হাত থেকে মনির পালাতে সক্ষম হয়েছে বটে কিন্তু এখন সে মুক্ত নয়। শহরের কোনো নিভৃত কোণে হাতে-হাতকড়া দেহে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আত্মগোপন করে আছে। না জানি কত কষ্ট হচ্ছে তার। সারাটা দিন পেটে কিছু পড়েছে কিনা কে জানে।

ক্রমে রাত বেড়ে আসে।

সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়। শহরে জ্বলে ওঠে অসংখ্য আলোর বন্যা। আজ অন্যান্য দিনের মত শহরে জনগণের ভীড় নেই। কেমন যেন নীরব থমথমে ভাব সমস্ত শহরটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। দু'চার জন পথিক অতি সন্তর্পণে পথ চলছে মাত্র। কোন জরুরী প্রয়োজন ছাড়া তারা বাইরে বেরিয়েছে বলে মনে হয়না। পথ চলতে গিয়েও ভীতভাবে চারিদিকে লক্ষ্য করছে। তাদের ভয়ের একমাত্র কারণ দস্যু বনহুর।

গোটা শহরে যানবাহন চলাচল করলেও সংখ্যায় অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ অনেক কম। নিতান্ত কাজের চাপে তারা হয়তো গন্তব্য স্থানে চলেছে।

শুধু পুলিশ ভ্যান আর পুলিশ ফোর্স।

শহরের পথে পথে আজ পুলিশ ভ্যানের ছুটাছুটি চলেছে। অগণিত অসংখ্য পুলিশ সমস্ত শহরে ছড়িয়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে।

সবাই সতর্কভাবে পাহারায় নিযুক্ত আছে।

পুলিশ বাহিনীর ভারী বুটের আর মাঝে মাঝে হুইসেলের তীব্র আওয়াজ কানে এসে পৌছুচ্ছে।

মনিরা পাথরের মূর্তির মত বসে আছে খাটের পাশে।

মরিয়ম বেগম নামাজ পড়লেন নিজ ঘরে।

রাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

সমস্ত বাড়ীটা এক সময় সুপ্তির কোলে ঢলে পড়লো।

মরিয়ম বেগম কখন যে জায়নামাজে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন নিজেই টের পাননি।

সরকার সাহেব নীচের তলায় তাঁর নিজের বিশ্রাম কক্ষে শুয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। আজ ক'দিন তাঁর নানা রকম ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে। পর পর এটা না ওটা বিপদ চলেছেই চৌধুরীবাড়িতে। বিশেষ করে মনিরার বিষ পান ও তার অন্ধ হয়ে যাবার পর সব সময় বাড়িতে ডাক্তার আর ডাক্তার লেগেই রয়েছে।

সারাদিন সরকার সাহেবকেই নানাদিকে সামলিয়ে চলতে হয়, বিশ্রাম করবেন কখন।

বয়স তো তাঁর কম নয়, পঞ্চাশের উপর হবে। মজবুত গঠন তাই এখন তিনি শক্ত এবং সুস্থ আছেন অন্যান্য সঙ্গী সাথীর চেয়ে। ক'দিন পর আজ সরকার সাহেব একটু নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছেন।

মরিয়ম বেগমের অবস্থাও তাই, আজ ক'দিন হলো এক নাগাড়ে ঘুম জেগেছেন। ক্লান্তি আর অবসাদে দেহমন সবই ভেংগে পড়েছে, তিনি নামাজের বিছানায় একটু গড়িয়ে নিতে গিয়ে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়েছেন।

দেয়াল ঘড়িটা রাত দুটো ঘোষণা করলো।

মনিরা তখনও জেগে বসে আছে চিত্রার্পিতের মাত খাটের এক পাশে।

মনিরার বুকের মধ্যে প্রচন্ড ঝড় বয়ে যাচ্ছে না জানি ভোরের সংবাদ তার কানে কি সংবাদ পৌছাবে।

মনিরা কিছুতেই আজ নিজকে সুস্থির করতে পারছে না। মনের মধ্যেও অন্ধকার, বাইরেও অন্ধকার—দুনিয়াটাই বুঝি সম্পূর্ণ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। একটু আলো একটু আলোর জন্য লালায়িত হয়ে উঠলো মনিরা।

ঠিক এমন সময় নীচে শোনা গেলো পুলিশের বিক্ষিপ্ত বাঁশীর শব্দ সঙ্গে সঙ্গে একটা শোর হাঙ্গামা।

চমকে উঠলো মনিরা, তাড়াতাড়ি উঠিপড়ি করে এগিয়ে গেলো পেছনের জানালার পাশে, দেখতে সে কিছু পাচ্ছেনা তবু বুঝতে পারলো।

পুলিশের বাঁশীর শব্দ আর লোকজনের কলকণ্ঠ শুনে মনিরা সংজ্ঞা হারার মত হয়ে পড়লো। নিশ্চয়ই তার স্বামী এ পথে আসছিলো তার সঙ্গে দেখা করতে। হায় কি হলো মনিরা আর্তনাদ করে ডাকলো —মামীমা, মামীমা— সরকার সাহেব সরকার সাহেব--

মনিরার আর্তকণ্ঠে মরিয়ম বেগমের ঘুম ছুটে গেলো। শুধু তারই নয় মনিরার কণ্ঠস্বরে চাকর বাকরের দল—তারাও জেগে উঠলো।

মরিয়ম বেগম ছুটে গেলেন মনিরার কক্ষে।

ততক্ষণে চাকর বাকরের দলও যে যেদিক থেকে পারে ছুটে এলো। ব্যাপার কিছু বুঝতে না পেরে সবাই হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

মরিয়ম বেগম এগিয়ে গিয়ে মনিরাকে চেপে ধরলেন—কি হয়েছে মনিরা কি হয়েছে? ব্যস্ত কণ্ঠস্বর তাঁর।

মনিরা কাঁদো কাঁদো গলায় বললো—শুনতে পাচ্ছো না মামীমা , ওকে আবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

মনির, আমার মনির আবার পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। কি করে জানলি মনিরা। কি করে জানলি তুই?

সে ঐ পথে আসছিলো, তোমার-আমার সঙ্গে দেখা করতে।

মরিয়ম বেগম দু'হাতে মাথা ধরে মেঝেতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে বললেন— আবার একি হলো আল্লাহ। উঠে দাঁড়ালেন তিনি— কোথায়? কোথায় আমার মনির একনজর ওকে আমি দেখবো মরিয়ম বেগম সিড়ি বেয়ে নীচে নেমে চললেন।

সরকার সাহেবেরও ঘুম ভেংগে গিয়েছিলো, তিনি দড়বড় উঠে আসছিলেন, সিড়ির মুখে বেগম সাহেবকে এলোমেলো উর্ন্মাদিনীর ন্যায় কাঁদতে কাঁদতে নামতে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন, হঠাৎ ঘুম ভেংগে যাওয়ায় তিনি কিছু বুঝতে পারছেন না।

সরকার সাহেবকে দেখেই মরিয়ম বেগম কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন— সরকার সাহেব মনিরকে আবার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। শীঘ্র যান শীঘ্র যান দেখুন, একবার আমাকে দেখতে দিন।

মরিয়ম বেগম বাইরে যাবার জন্য পা বাড়াচ্ছিলেন সরকার তাঁর পথরোধ করে বললেন—বেগম সাহেবা আপনি অপেক্ষা করুন আমি দেখছি।

সরকার সাহেব বেরিয়ে গেলেন।

ততক্ষণে বাইরের হট্টগোল কমে এসেছে অনেক। মাঝে মাঝে পুলিশ ভ্যানের ছুটাছুটির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

অল্পক্ষণ পর ফিরে এলেন সরকার সাহেব মুখমন্ডল তার বিষণ্ন মলিন।

মরিয়ম বেগম ব্যস্তকণ্ঠে বলে উঠলেন—কি হলো সরকার সাহেব, কি হলো বলুন? আমার মনির--

হাঁ, সে পেছন প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলো। অমনি পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

হায় হায়, একি হলো সরকার সাহেব? একি হলো? কোথায় আমার মনির, আমি ওকে একনজর দেখবো।

বেগম সাহেবা তাকে গ্রেপ্তার করার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ভ্যানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মরিয়ম বেগম দু'হাতে মুখ চেপে ধরে ডুঁকরে কেঁদে উঠলেন।

মরিয়ম বেগমের কান্নার শব্দ গিয়ে পৌঁছলো দোতলার কক্ষে মনিরার কানে। বুঝতে পারলো, তার স্বামী পুনরায় পুলিশের হাতে বন্দী হয়েছে।

মনিরা ধপ্ করে পড়ে গেলো খাটের পাশে কপাল কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লো।

ঝি—চাকরের দল সবাই ব্যস্ত হয়ে কেউ ছুটে গিয়ে মনিরাকে তুলতে চেষ্টা করলো কেউ ছুটলো নীচে—আম্মা, আম্মা আপামনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

মরিয়ম বেগম হিতাহিত জ্ঞানশূন্যের মত সিড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলেন।

সরকার সাহেব আর অন্যান্য চাকর—বাকর সবাই অনুসরণ করলো বেগম সাহেবাকে।

মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন মনিরা সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে মেঝেতে রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে মেঝের কার্পেট।

সরকার সাহেব তাড়াতাড়ি মনিরার মাথাটা হাতের উপর তুলে নিয়ে ব্যস্তভাবে বললেন—পানি নিয়ে এসো, পানি। মনিরা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

কে কোন দিকে ছুটলো ঠিক নেই। কেউ পানি নিয়ে দৌড়ে এলো, কেউ ছেড়া কাপড় নিয়ে---

মরিয়ম বেগম তো মাথা কুটে বিলাপ শুরু করলেন।

সরকার সাহেব মনিরাকে তুলে বিছানায় শুইয়ে দিলেন, তারপর মাথায় ও চোখে মুখে পানির ছিটা দিতে লাগলেন।

অনেক চেষ্টা করেও জ্ঞান ফিরে এলোনা।

সরকার সাহেব বললেন—এখনও মনিরার জ্ঞান ফিরছে না বেগম সাহেবা—উপায়?

মরিয়ম বেগম পাগলিনীর ন্যায় কাঁদছিলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—ডাক্তার ডাকুন সরকার সাহেব ডাক্তার ডাকুন। আমর সব গেছে মনিরাও যদি চলে যায় তবে কি নিয়ে বাঁচবো। শীগ্‌গীর ডাক্তার ডাকুন--

নকীব পাখা নিয়ে মনিরার মাথায় বাতাস করছিলো আর বারবার গামছায় চোখ মুছছিলো সেও বলে উঠলো—ডাক্তার ডাকেন সরকার সাহেব নইলে আপামনিকে বাঁচানো যাবে না---

হাঁ, তাই ডাকছি। সরকার সাহেব তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন করলেন।

❑

গভীর রাতে কোথা থেকে ফোন এলো।

ডক্টর বোস সবেমাত্র একটা কঠিন কেস অপারেশন করে ফিরে এসেছেন। আজ তাঁর হসপিটাল থেকে ফিরতে রাত দুটো বেজে গিয়েছিলো। কেবলমাত্র খেয়ে দেয়ে শয্যা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন তিনি, অমনি টেবিলে ফোনটা বেজে উঠলো সশব্দে।

ডক্টর বোস অনিচ্ছাসত্ত্বে রিসিভার হাতে তুলে নিয়ে কানে ধরলেন—হ্যালো স্পিকিং ডক্টার বোস। কে আপনি? কোথা থেকে বলছেন? চৌধুরীবাড়ি থেকে --কি বললেন চৌধুরী কন্যা হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেছে? না না, —এ আমাদের কর্তব্য, আচ্ছা আসাছি।

ডাক্তার বোস চিরকুমার। বয়স যদিও চল্লিশের উপর তবু তাঁকে যুবক বলে ভ্রম হয়। শক্ত মজবুত গঠন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য—খুব মোটা বা একেবারে ছিপছিপে নয়। অলসতা বলতে তাঁর নেই, রোগীর সেবা করাই তাঁর জীবনের ব্রত। কান্দাই শহরে ডাক্তার বোস একনাগাড়ে প্রায় পাঁচ বছর আছেন। হসপিটালে সার্জনের পোষ্টে আছেন তিনি। কান্দাইয়ের অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। চৌধুরীবাড়ির সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট পরিচিতি ঘটেছে। কারণ মরিয়ম বেগমের মাঝে মাঝে এটা-ওটা অসুখ লেগেই থাকে। ডাক্তার বোসই চিকিৎসা করেন। মনিরার জন্য তাঁকে প্রায়ই চৌধুরী বাড়িতে যেতো হতো কাজেই ডাক্তার বোসের চৌধুরীবাড়ি অপরিচিত নয়।

ডাক্তার বোস ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করলেন নাইট ড্রেস পাল্টানোর জন্য কিন্তু রুমে প্রবেশ করেই বিস্মিত হলেন। তিনি কিছু পূর্বে হসপিটাল থেকে ফিরে ড্রেস পাল্টে নাইট ড্রেস পরার সময় নিজ হাতে বাগানের দিকের শার্সীটা বন্ধ করেছিলেন—মাত্র অল্পক্ষণ আগের কথা, অথচ এখন শাসীটা সম্পূর্ণ খোলা দেখতে পেলেন। ফিরে তাকাতেই তাঁর চোখ ছানাবড়া হলো, পাশের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক যুবক।

ইতিপূর্বে একে কোথাও দেখেছেন বলে মনে হলো না, কিন্তু মুখটা পরিচিত লাগছে যেন।

ডাক্তার বোস অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন যুবকের দিকে। সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা চোখ দুটিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসি রেখা। হাত দু'টিকে বুকের সঙ্গে রেখে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ডাক্তার বোস বলে উঠলেন কে আপনি?

হাসলো যুবক ম্লান এক টুকরো হাসি, তারপর বললো—আমার পরিচয় দেবো পরে। আগে বলুন --সরে এলো যুবক ডাক্তার বোসের পাশে—আগে বলুন আমার কথা রাখবেন?

যদি রাখবার মত হয় রাখবো কিন্তু আমি প্রথমে জানতে চাই আপনি কি উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন? আর কে আপনি?

শেষ প্রশ্নের জবাব পাবেন পরে কিন্তু প্রথমে প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। আমি এখানে কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে আসনি। এইমাত্র আপনি আলাপ করছিলেন যেখানে যাবার জন্য, সেখানে আমাকেও নিয়ে যেতে হবে।

চৌধুরীবাড়িতে? বললেন ডাক্তার বোস।

হাঁ, আমাকে সেখানে যেতে হবে—জরুরী।

কিন্তু আপনার পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত আমি আপনার কোনো কথা শুনতে রাজী নই। তাছাড়া আমি ডাক্তার, চৌধুরীবাড়ি যাবো আমি রোগী দেখতে।

ডাক্তার আপনার কর্তব্যের চেয়ে আমার কর্তব্য কোনো অংশে কম নয়, মনিরা আমার স্ত্রী।

আপনি---

আমি দস্যু বনহুর।

আপনি দস্যু বনহুর। চৌধুরী কন্যা মনিরা আপনার বিবাহিতা স্ত্রী?

হাঁ ডাক্তার। এ কথা বাইরের কেউ জানে না, আজ আপনাকে না বলে পারলাম না। ডাক্তার জানি আপনি একজন মহান ব্যক্তি। দেশ ও দশের জন্য

নিজকে বিলিয়ে দিয়েছেন। নিজের জন্য আপনি কোনো সময় ভাবেন না। সত্যি আপনার মহৎ জীবনকে আমি অভিনন্দন জানাই।

বনহুর যখন কথাগুলো বলছিলো, তখন ডাক্তার বোস দু'চোখে রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে তাকিয়েছিলেন তার দিকে। ওকে প্রথম দেখেই কেমন ধোঁকা লেগেছিলো মনে। প্রথমে সন্দেহ হয়েছিলো চোর বা দুষ্টলোক বলে। কিন্তু চেহারা দেখে সন্দেই তার সীমাবদ্ধ হয়নি। চোর বা দুষ্ট লোক হলে সে ওভাবে প্রকাশ্যে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না। মনের কোণে একবার জেগেছিলো ডাক্তার বোসের—দস্যু বনহুর পলাতক আছে। তবে কি সেই? সমাধান খুঁজে পাবার পুর্বেই বনহুর নিজের পরিচয় দিয়েছিলো।

ডাক্তার বোসকে তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকতে দেখে বনহুর বললো আবার ডাক্তার আপনি জানেন আজ বেলা আটটায় আমি পুলিশ ভ্যান থেকে তাদের সতর্ক পাহারার বেষ্টনী ভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়েছি। সমস্ত শহরে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছে। রেডিওতে বারবার সাবধান বাণী প্রচার করা হচ্ছে। এতদসত্ত্বেও আমি আপনার বাগানে এসে আত্মগোপন করে ছিলাম, এ শহরে একমাত্র আপনার উপর আমার বিশ্বাস—আমি আপনার সাহায্য পাবো।

এতগুলো কথা বলে থামলো বনহুর।

ডক্টর বোস নিশ্চুপ বনহুরের কথাগুলো শুনে যাচ্ছিলেন এবং গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করছিলেন। তিনি বললেন—কি সাহায্য আপনি আমার কাছে কামনা করেন?

বনহুর যেন অনেকটা আশ্বস্ত হলো, বললো সে—এ শহরে প্রতিটি রাস্তায় এখন পুলিশ কড়া পাহারা দিচ্ছে। আমি আপনার এখানে অনেক, চেষ্টায় এসে পৌছতে সক্ষম হয়েছি। আমি যে মুহুর্তে আপনার বাগান বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়িয়েছি ঠিক সেই দণ্ডেই আপনি চৌধুরীবাড়ি থেকে ফোন পেলেন। ডাক্তার, আপনি আমাকে চৌধুরী বাড়ি নিয়ে চলুন।

কি করে তা সম্ভব?

ডাক্তার, আপনার সহকারী বলে পরিচয় দেবেন। তাছাড়া আপনার গাড়ি পুলিশদের অতি পরিচিত; কোথায় কখন রোগী দেখতে যাচ্ছেন—সে কথা কাউকে বুঝিয়ে বলতে হবে না। পুলিশ বাহিনী আপনার চিহ্ন করা গাড়ী দেখলেই ছেড়ে দেবে।

কিন্তু হঠাৎ যদি---

গ্রেপ্তার হই?

হাঁ, কেউ যদি চিনে ফেলে?

সে জন্য দায়ী আপনি নন। ডাক্তার দস্যু বনহুর নিজে মরতে প্রস্তুত আছে, তবু হিতকাঙ্ক্ষীকে সে কোনো দিন মরতে দেবে না। কিন্তু ছলনাকারী বা অবিশ্বাসীকে ক্ষমা করতে জানে না দস্যু বনহুর। ডাক্তার আপনি যদি আমার সঙ্গে কোনো রকম চাতুরি করেন তাহলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য। শেষ অংশের কথাগুলো দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর। চোখে মুখে জেগে উঠলো তার পৌরুষ ভাব। দক্ষিণ হাত মুষ্টিবদ্ধ হলো।

ডাক্তার বোস মুগ্ধ হলেন।

দস্যু বনহুরের নামই তিনি এতদিন শুনে এসেছেন, আজ সেই দুর্ধর্ষ দস্যু তার সামনে দন্ডায়মান। কল্পনার দৃষ্টি দিয়ে এতদিন এই দস্যু সম্বন্ধে তাঁর যে একটা মনোভাব জন্মেছিলো নিমিষে তা মুছে গেলো। দস্যু হলেও বনহুর মানুষের মত একজন মানুষ যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায় উক্তি করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেনা।

ডাক্তার বোস দস্যু বনহুরের পিঠে হাত রাখলেন—আমি শপথ করলাম, আপনাকে আমি যথাসাধ্য সাহায্য করবো।

ধন্যবাদ ডাক্তার, ধন্যবাদ।

ডাক্তার বোস নিজের পরিচ্ছদ পাল্টে নিলেন, এবং দস্যু বনহুরকে তাঁরই অন্য এক সেট ড্রেস পরবার অনুমতি দিলেন।

❑

ডাক্তার বোস এবং তাঁর সহকারী ডাক্তার চন্দনের বেশে দস্যু বনহুর গাড়িতে চেপে বসলো।

কান্দাইয়ের পথ ধরে ডাক্তার বোসের গাড়ী দ্রুত এগিয়ে চললো চৌধুরী বাড়ি অভিমুখে। ডাক্তার বোসের গাড়িতে হসপিটালের চিহ্ন অঙ্কিত ছিলো কাজেই পুলিশবাহিনী প্রতিটি রাস্তায় সতর্ক পাহারায় নিযুক্ত থাকলেও এ গাড়িটিকে কোনো রকম বাধা দিলো না তারা।

শত শত পুলিশ ফোর্স দাঁড়িয়ে রইলো পথের ধারে—দস্যু বনহুর ডাক্তার বোসের সাথে চৌধুরী বাড়িতে পৌঁছে গেলো।

চৌধুরীবাড়ির গাড়ী বারান্দায় ডাক্তার বোসের গাড়ী পৌঁছতেই সরকার সাহেব এগিয়ে এলেন—আপনি এসে গেছেন ডাক্তার বাবু, মা মনির সংজ্ঞা এখনও ফিরে আসেনি।

ডাক্তার বোস গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালেন পরে নামলো চন্দন—বেশী দস্যু বনহুর।

ডাক্তার বোস চন্দনকে লক্ষ্য করে বললেন—সরকার সাহেব এ আমার সহকারী চন্দন। রাতের ব্যাপার কিনা তাই সঙ্গে নিয়ে এলাম—হঠাৎ যদি কোনো দরকার পড়ে।

খুব ভাল করেছেন ডাক্তার বাবু। চলুন আপনারা। সরকার সাহেব ব্যাগ হাতে নিলেন—চলুন।

ডাক্তার বোস ও চন্দন এগিয়ে চললো সিঁড়ি বেয়ে উপরে।

সরকার সাহেব আর দু'জন চাকর তারাও অনুসরণ করলো ডাক্তার বোস ও চন্দনকে।

ডাক্তার বোস কক্ষে প্রবেশ করতেই মরিয়ম বেগম মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন— ডাক্তার বাবু, মা এবার আর বাঁচবে না।

ডাক্তার বোস মনিরার পাশে এগুবার পূর্বেই চন্দন দ্রুত এগিয়ে গেলো খাটের পাশে। মনিরার ছিন্নলতার মত চেহারার দিকে তাকিয়ে নিজকে কিছুতেই সংযত রাখতে পারছিলোন না সে। একি চেহারা হয়ে গেছে মনিরার! জীর্ণ হয়ে গেছে দেহ ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখমন্ডল চোখ দুটো বসে গেছে কালো হয়ে গেছে চোখের নীচে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে রেখে বললো চন্দন বেশী বনহুর—ডাক্তার আগে রোগী দেখুন।

ডাক্তার বোস মনিরাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন।

মরিয়ম বেগম ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন আমার মা বাঁচবে তো ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বোস বেশ কিছুক্ষণ ধরে মনিরাকে পরীক্ষা করে সোজা হয়ে বসলেন, ললাটে গভীর চিন্তার ছাপ ফুটে উঠলো।

বনহুর ব্যাকুল আগ্রহে তাকাচ্ছিলো ডাক্তার বোসের মুখের দিকে কিন্তু বলতে পারছিলো না কিছু। মাঝে মাঝে সে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন মনে ভাবছিলো অপরাধী সন্তান আমি; তোমার পাশে দাঁড়িয়েও তোমাকে পরিচয় দিতে পারছিনে, আমাকে তুমি ক্ষমা করো মা।

ডাক্তার বোস যখন কিছু চিন্তা করছেন তখন মরিয়ম বেগম বলে উঠলেন—কেমন দেখলেন?

ডাক্তার বোস বললেন—অবস্থা খুব ভাল নয় অত্যন্ত উত্তেজিত বা কোনো দুশ্চিন্তার জন্য তার এমন হয়েছে। আচ্ছা বেগম সাহেবা, আমি আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করবো সঠিক জবাব দেবেন?

বলুন ডাক্তার বাবু?

কক্ষে তখন চৌধুরীবাড়ির চেনা—অচেনা অনেকে রয়েছে। বনহুর হঠাৎ কোনো কথা বলতেও পারছে না, এদিকে মনের চলঞ্চলতা কিছুতেই যেন চেপে রাখতে পারছে না। মনিরার মাথায় হাত রাখবার জন্য মনটা তার অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে যে অপরাধী—নিজেকে প্রকাশ করার নেই কোনো উপায়।

ডাক্তার বোস বুঝতে পারলেন—বনহুর, চৌধুরী-কন্যার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন লক্ষ্য করে ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছে। তবু তিনি মরিয়ম বেগমকে বললেন—হঠাৎ আজ এভাবে অজ্ঞান হয়ে যাবার কারণ কি? নিশ্চয়ই এমন কিছু ঘটেছে বা ঘটেছিলো যা তার মনে ভীষণ আঘাত করেছে?

মরিয়ম বেগম সন্দিগ্ধভাবে তাকালেন চন্দনের ছদ্মবেশী বনহুরের দিকে।

ডাক্তার বোস বললেন—সে অপরলোক নয়, আমার সহকারী চন্দন সেন। আপনি সমস্ত খুলে বলনু?

মরিয়ম বেগম বললেন এবার —পর পর কয়েকটা দুর্ঘটনা মনিরার জীবনে ঘটেছে যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সব কথা বলা যায় না সবার কাছে।

কিন্তু আপনি ভুল করছেন বেগম সাহেবা, ডাক্তার আর উকিলের কাছে কোনো কথা গোপন করা উচিত নয়। কারণ তা করলে ডাক্তার রোগীর আসল রোগ সম্বন্ধে সঠিক চিকিৎসা করতে সক্ষম হন না। আর উকিল বা ব্যারিষ্টারের নিকটে যদি আসল কথা গোপন রেখে সাজানো কাহিনী বলেন এতে উকিল বা ব্যারিষ্টার কোনো সময় সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারবেন না। কাজেই আপনি বুঝতে পারছেন আপনার কন্যা মনিরার জীবন এখন সঙ্কটাপন্ন। তাকে সঠিক চিকিৎসা করে সারিয়ে তুলতে হবে।

মরিয়ম বেগম অনেক চিন্তা করে বললেন—আজ সকাল থেকে মনিরার মনের অবস্থা খুব খারাপ ছিলো। সমস্ত দিন কিছুই মুখে দেওয়াতে পারিনি।

কিন্তু আসল কথা আপনি চেপে যাচ্ছেন, সংক্ষেপে বলুন ব্যাপারটা?

মরিয়ম বেগম কি ভাবে আসল কথা বললেন সে কথা যে কাউকে বলবার নয়। কেন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠলেন তিনি, ঢোক গিলে বললেন এবার -ডাক্তার বাবু আমার মনিরার বিয়ে হয়েছে সে বিবাহিত—

ডাক্তার বোস কিছুমাত্র অবাক না হয়ে বললেন —বলুন?

বিয়ের পর ওর স্বামী কোনো কারণবশতঃ দূরে বহু দূরে চলে গেছে, যেখান থেকে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই।

ডক্টর বোস তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে।

মরিয়ম বেগম বললেন আবার—জানেন তো ডাক্তার বাবু, মেয়েদের স্বামীই সর্বস্ব। মনিরা সেই কারণেই সদা বিষন্ন থাকে। লোকে জানে মনিরার এখনও বিয়ে হয়নি।

হুঁ বুঝলাম মনিরার বিয়ে আপনারা গোপনে সমাধা করেছিলেন।

হাঁ ডাক্তার বাবু।

স্বামীর বিরহ—বেদনা মেয়েদের জীবনের চরম এক পরাজয়। কথাটা বললেন ডাক্তার বোস।

মরিয়ম বেগম বললেন—আজ রাত দুটো কিংবা আড়াইটা হবে যখন আমাদের বাড়ির পাশ থেকে দস্যু বনহুরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়, ঐ সময় হঠাৎ মনিরা সংজ্ঞা হারিয়ে --বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠস্বর।

চমকে ফিরে তাকায় বনহুর মায়ের মুখের দিকে মুখে—চোখে তার রাজ্যের বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

ডাক্তার বোসের মুখমন্ডলেও একরাশ বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ে তিনি হতভম্বের মত প্রশ্ন করে বসেন—দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার হয়েছে।

এবার বললেন সরকার সাহেব—হাঁ ডাক্তার বাবু একঘন্টা পূর্বে আমাদের বাড়ির পেছন বাগানবাড়ির প্রাচীরের পাশে তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। হঠাৎ ঐ সংবাদ শুনে মনিরা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে--- তারপর থেকে আর জ্ঞান ফিরেনি।

ডাক্তার বোস সকলের অলক্ষ্যে একবার চন্দনবেশী বনহুরের মুখে তাকালেন।

বনহুর বললো এবার—ডাক্তার, আমার মনে হচ্ছে দস্যু বনহুর গ্রেপ্তার সংবাদেই মিসেস মনিরা সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছেন। এখন কি করা দরকার?

ডক্টর বোস বললেন—ব্যাপার অত্যন্ত জটিল চন্দন। আমার মনে হচ্ছে মিসেস মনিরাকে সুস্থ করে তোলার ব্যাপারে তার স্বামীকে একান্ত প্রয়োজন। নইলে একে বাঁচানো দুষ্কর হবে।

মরিয়ম বেগম ধরাগলায় বললেন—কিন্তু কোনো উপায় নেই। ডাক্তার বাবু।

ডাক্তার বাবু তখন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন।

বনহুর বলে উঠলো —উপস্থিত যেভাবে মিসেস মনিরার জ্ঞান ফিরে আসে সেই চেষ্টা করুন ডাক্তার।

হাঁ, আমি উপস্থিত মনিরার জ্ঞান ফিরে আনার চেষ্টা করছি। ডাক্তার বোস একটা ইনজেকশান দিলেন এবং নাকে একটা ওষুধ ধরলেন।

ব্যাকুল আগ্রহে সবাই তাকিয়ে আছে মনিরার মুখের দিকে। প্রতিটি ব্যক্তির চোখে মুখে সেকি আকুলতা।

ডাক্তার বোস পর পর ইনজেকশান ও নাকে ওষুধ ধরতে লাগলেন।

ভোর হবার কিছু পূর্বে জ্ঞান ফিরে এলে মনিরার। জ্ঞান ফিরতেই অস্ফুট কণ্ঠে বললো—মামীমা তুমি কোথায়? হাত বাড়ালো মনিরা সামনে।

মরিয়ম বেগম পাশেই ছিলেন সরে এসে ঝুঁকে পড়লেন এই যে মা আমি।

মনিরা বেদনাভরা কণ্ঠে পুনরায় বলে উঠলো—মামীমা, ওকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে? চলে গেছে পুলিশ ওকে নিয়ে?

মরিয়ম বেগম আঁচলে অশ্রু মুছলেন।

ডাক্তার বোস গম্ভীরভাবে একবার তাকালেন সহকারী চন্দনবেশী বনহুরের মুখের দিকে।

ডাক্তার বোস এবং বনহুর বুঝতে পারলো—পুলিশ দস্যু বনহুর ভ্রমে কাউকে গ্রেপ্তার করেছে এবং সেই সংবাদ শুনেই মনিরা সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলো।

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো, কে সেই লোক যে আজ গ্রেপ্তার হয়েছে। কিন্তু কে তার মনের প্রশ্নের জবাব দেবে।

মনিরা তখন চিৎকার করে বলছে—বলো বলো, মামীমা ওকে ধরে নিয়ে চলে গেছে? আমাকে একটিবার দেখতে দিলো না আমাকে একটি বার দেখতেও দিলে না ওরা---

ডাক্তার বোস মনিরাকে শান্ত হবার জন্য গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এত উত্তেজিত হলে খারাপ হবে। এখন ঘুমাতে চেষ্টা করো।

না না, আমি ঘুমাতে পারবো না ডাক্তার বাবু যতক্ষণ না জানবো সে মুক্ত।

বনহুর মনিরার পাশে ঝুঁকে কিছু বলতে যাচ্ছিলো।

ডাক্তার বোস কক্ষস্থ অন্যান্য সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বনহুর কিছু বলবার পূর্বেই বলে উঠলেন—মনিরা, সে মুক্তই আছে। বিশ্বাস করো আমার কথা—সে মুক্ত আছে।

ডাক্তার বাবু আমাকে আপনি মিথ্যা সান্ত্বনা দিচ্ছেন আমি--আমি নিজের কানে শুনেছি--- সে এখানেই আসছিলো। আমার সঙ্গে দেখা করতে--

সরকার সাহেব মরিয়ম বেগমের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। মনোভাব—কথাটা ডাক্তার বাবু জেনে ফেললেন, এটা কি উচিৎ হচ্ছে—

মরিয়ম বেগম বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন, তাঁর মুখভাবও কেমন ভয়ার্ত ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার বোস সুচতুর ব্যক্তি তিনি সরকার এবং মরিয়ম বেগমের মুখোভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন তারা বেশ ঘাবড়ে গেছেন। মনে করেছেন—ডাক্তার তাঁদের ভিতরের রহস্য জেনে ফেললেন। কাজেই তিনি যেন কিছুই বুঝতে পারেননি এমনি ভাব দেখিয়ে বললেন মনিরার মনের অবস্থা এখন স্বাভাবিক নয়। এখন তাকে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দেওয়া দরকার। আমি একটা ঘুমের ওষুধ দিচ্ছি—খেলে ঘুমাবে।

ডাক্তার বোস দেখলেন তাঁকে এবার উঠতে হয়। তাঁর সঙ্গী সম্বন্ধে এখন তিনি বেশী চিন্তিত কারণ রাজপথ বেয়ে তাকে শহরের বাইরে যেতে হবে।

ডাক্তার বোস মরিাকে ঘুমের ওষুধ দিলেন। এবং তাকে কোনো চিন্তা করতে বারণ করলেন।

ডাক্তার বোস উঠে দাঁড়ালেন, দেয়ালঘড়িটায় তখন ভোর ছ'টা ঘোষণা করলো।

বনহুর বিদায়কালে ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকালো মনিরার মুখের দিকে মনিরা তাকে এত কাছে পেয়েও চিনতে পারেনি, মায়ের চোখে চশমা নেই, হয়তো তাই তিনি চিনতে পারলেন না।

বনহুরের মুখে আজ কোনো মেকাপ করা দাড়ি গোঁফ ছিলো না তবে মাথায় ক্যাপ ছিলো একটু অন্য ধরনের আর চোখে ছিলো কালো চশমা।

মনিরা যে দৃষ্টি শক্তি হারিয়েছে এ কথা বনহুর এখনও জানে না। অসুস্থ মনিরা যখন মামীমাকে বলছিলো--মামীমা তুমি কোথায়? তখন বনহুর কিছুটা বিস্মিত হয়েছিলো বটে কিন্তু পরক্ষণেই ভেবেছিলো—হঠাৎ সংজ্ঞা লাভের পর ঐ রকমই হয় বা হয়ে থাকে। কাজেই সে জানতে পারলো না—তার মনিরা সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন।

মনিরা সংজ্ঞালাভের পর বনহুর কোনো কথা বলেনি। কথা বললে তার কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই চিনতে পারতো মনিরা। মরিয়ম বেগমের মনেও যে বনহুরের কণ্ঠস্বর একটা আলোড়ন জাগায়নি তা নয়। কিন্তু ডাক্তার বোস যাকে নিজ সহকারী বলে পরিচয় দিলেন তার সম্বন্ধে অন্য কোনো রকম চিন্তা করা অবান্তর।

ডাক্তার বোসের সঙ্গে বিদায় নিলো বনহুর।

যাবার সময় ইচ্ছা করেই একটা কথা বললো—মিসেস মনিরা, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমান। যা শুনেছেন বা জেনেছেন—সব মিথ্যা।

কে,কে আপনি? মনিরা ব্যস্তকণ্ঠে প্রশ্ন করলো।

ডাক্তার বোস বললেন—চন্দন এসো, শীঘ্র বাসায় ফিরে যেতে হবে।

আর বিলম্ব না করে পা বাড়ালেন তিনি সিড়ির পথে।

ডাক্তার বোস ও তাঁর সহকারী বিদায় গ্রহণের পর মনিরা বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লো। বললো সে—মামীমা, ডাক্তার ছাড়া কে এসেছিলো আমার ঘরে?

মরিয়ম বেগম মনিরার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—ডাক্তার বোসের সহকারী চন্দন সেন।

অস্ফুট কণ্ঠে বললো মনিরা—মামীমা, তুমি ভুল করেছো! তুমি ভুল করেছো মামীমা। চন্দন নয় মনিরার মুখমন্ডল দীপ্ত হয়ে উঠলো—সে বন্দী হয়নি! সে বন্দী হয়নি

মনিরা, তুই কি পাগল হয়ে গেলি মা?

না মামীমা, আমি পাগল হইনি। সে এসেছিলো, আমি শুনতে পেয়েছি তার কণ্ঠস্বর। তুমি চোখ থাকতেও তাকে চিনতে পারলে না, মামীমা...সে বন্দী হয়নি।

হাঁ, ঐ যে আমাকে বলে গেলো—যা শুনেছি, যা জেনেছি—সব মিথ্যা।

মামীমা, তোমার ছেলে বন্দী হয়নি...

সরকার সাহেব নিজে দেখে এসেছেন আমার মনিরকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে....

না না না, সরকার সাহেব ভুল দেখেছেন...সেই কণ্ঠস্বর..সেই কণ্ঠস্বর—এ কি কোনো দিন ভুলবার, আর কেউ না বুঝলেও আমি তাকে তার কণ্ঠস্বরে চিনতে পেরেছি...

মনিরার মুখমন্ডলে একটা আনন্দের লহরী খেলে যায়।

মরিয়ম বেগম তাকিয়ে থাকেন অবাক হয়ে।

❑

পথের শেষে বনাঞ্চলের ধারে একটা নিভৃত স্থানে গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়ালো বনহুর।

ডাক্তার বোসও পথে নেমে দাঁড়ালেন।

বনহুর ডাক্তার বোসের দক্ষিণ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ কণ্ঠে বললো—ডাক্তার, আমি চিরকৃতজ্ঞ। অর্থ দিয়ে আপনাকে আমি ছোট করতে চাইনে। আমার হৃদয়ের অফুরন্ত শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ডাক্তার বোসের মুখেও ফুটে উঠেছে একটা দীপ্ত উজ্জল মধুর ভাব; তিনি বলে ওঠেন—দস্যু বনহুরের বন্ধুত্ব লাভ আমার জীবনের এক পরম সম্পদ হয়ে রইলো।

ডাক্তার বোস গাড়িতে উঠে বসলেন।

ডাক্তার বোস স্বয়ং গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছিলেন, কাজেই ড্রাইভার ছিলো না, তিনিই গাড়ী ষ্টার্ট দিলেন।

বনহুর হাত নাড়তে লাগলো।

ডাক্তার বোসের গাড়ি যতক্ষণ পথের বাঁকে অদৃশ্য না হলো, ততক্ষণ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো বনহুর সেইদিকে।

বনহুরকে এবার আস্তানায় ফিরে যেতে হবে।

নির্জন পথ ধরে অগ্রসর হলো সে।

পথ চলছে আর ভাবছে নানা কথা। আজ পথে কোনো পাহারা নেই। কাজেই নিশ্চিন্ত মনে এগুচ্ছে সে।

দু'ধারে বন আর তার মাঝখান দিয়ে পথ।

এটা কান্দাই শহর ছেড়ে অনেক দূর। এপথে কোনো যানবাহন চলাচল করে না। কচিৎ কোনো যানবাহন নিতান্ত প্রয়োজনে আসে বটে কিন্তু অত্যন্ত সাবধান সহকারে। এপথ অতি দুর্গম। বন্য হিংস্র জন্তু ও ডাকাতের ভয় আছে বলে কান্দাইবাসী এদিকে আসতে চায় না।

দস্যু বনহুর এই পথেই অগ্রসর হচ্ছিলো।

হঠাৎ একটা মোটরের শব্দ বনহুরের কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো।

মুহূর্তে পাশের ঝোপের মধ্যে আত্মগোপন করলো সে। বিশেষ করে এ পথে মোটর গাড়ি—আশ্চর্য বটে। বনহুর একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে দৃষ্টি রাখলো পথের দিকে।

হ্যাঁ, সত্য বটে একটা গাড়ি এদিকে দ্রুত আসছে। যদিও গাড়িটা তখনও বনের আড়ালে ছিলো, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো না, তবুও শব্দটা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিলো।

বনহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে লাগলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বনহুরের দৃষ্টিপথে গাড়িখানা প্রকাশ পেলো। বিস্ময় বিস্ফরিত চোখে দেখলো—একটা পুলিশ ভ্যান দ্রুত এগিয়ে আসছে। বারো-তেরো জন সশস্ত্র পুলিশ ভ্যানে দাঁড়িয়ে আছে। আরও অবাক হলো বনহুর—পুলিশ বাহিনী গাড়িতে দাঁড়িয়ে জয়ধ্বনি করছে। খুশীতে যেন আত্মহারা তারা। ব্যাপার কি, হঠাৎ পুলিশ ভ্যান এদিকেই বা আসছে কেন, আর পুলিশরা আনন্দধ্বনিই বা করছে কেন।

বনহুর হাঁটু গেড়ে ঝোপটার পাশে বসে রইলো চুপ করে।

পুলিশ ভ্যান দ্রুত এগিয়ে আসছে।

বনহুর ততই অবাক হচ্ছে। ভ্যানের উপরে পুলিশরা দু'হাত উপরে তুলে আনন্দভরা চীৎকার করছে।

আরও অবাক হলো বনহুর, পুলিশ ভ্যানটা এসে যখন দাঁড়িয়ে পড়লো পথের এক পাশে জঙ্গলের কিনারে।

বনহুর স্তব্ধ নিশ্বাসে দেখছে।

ভ্যান থেকে পুলিশরা নেমে পড়লো লাফ দিয়ে পথের বুকে। ভ্যানের পাশে ওরা দাঁড়ালো গোলাকার হয়ে, তারপর আর একবার জয়ধ্বনি করে উঠলো গোলাকার হয়ে, তারপর আর একবার জয়ধ্বনি করে উঠলো সবাই একসঙ্গে—জয়..সর্দারের জয়। দস্যু বনহুরের জয় দস্যু বনহুরের জয়.....

বনহুর হঠাৎ যেন আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো— এ যে তারই অনুচর দল। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বনহুর চিনতে পারলো হাবিলদারের ড্রেসে রহমানকে।

খুশী যেন তাদের ধরছে না, ব্যাপার কি?

বনহুর আর একটু কান পেতে শুনতে চেষ্টা করলো।

রহমান বলছে—সর্দার কোথায় এখনও জানি না। যতক্ষণ তিনি আমাদের মধ্যে ফিরে না এসেছেন ততক্ষণ আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত নই।

অন্য একজন বললো—ভাগ্যিস, তুমি এই ফন্দিটা বের করেছিলে দোস্ত। পুলিশ ভ্যান আটকিয়ে পুলিশদের বন্দী করে তাদের ড্রেস পরে একেবারে পুলিশ সেজে গিয়েছিলাম।

আর একজন বলে উঠলো—পুলিশ-সুপার পর্যন্ত আমাদের চিনতে পারেননি।

রহমান বললো এবার—আমি মনে করেছিলাম, নিশ্চয়ই সর্দার আজ চৌধুরীবাড়ি যাবেন। তাই এমনভাবে ডিউটি বেছে নিয়েছিলাম—একটাও আসল পুলিশ সেখানে থাকতে দেইনি। ভাগ্য, সর্দারের রূপ নিয়ে কোনো বেটা আজ গিয়েছিলো, তবেই তো নিশ্চিন্ত হতে পেরেছি কতকটা। দস্যু বনহুর বলে গ্রেপ্তার করে হাঙ্গেরী কারাগারে পৌছে দিয়েছি। এখন পথের পুলিশ পাহারা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সর্দার এই সুযোগে শহর থেকে সরে পড়তে পারবেন। রাখে আল্লা মারে কে। সরদারকে আল্লাহ রক্ষা করবেন।

বনহুরের কাছে এবার সব পরিস্কার হয়ে এলো। রহমান দলবল নিয়ে তাকে উদ্ধারের চেষ্টায় পুলিশ সেজেছিলো। কিন্তু কে সে যে এখন দস্যু বনহুরের রূপ নিয়ে হাঙ্গেরী কারাগারে বন্দী হয়েছে?

বনহুর আর নিজেকে আত্মগোপন করে রাখতে পারলো না। এবার সে মাথার ক্যাপ খুলে বেরিয়ে এলো ঝোপের আড়াল থেকে, গম্ভীর কণ্ঠে ডাকলো—রহমান!

এক সঙ্গে পুলিশ ড্রেস পরিহিত তার অনুচরবর্গ বিস্ময়ে চমকে উঠলো।

রহমান অস্ফুট আনন্দধ্বনি করে উঠলো—সর্দার!

বনহুর তার বিশ্বস্ত অনুচরগণের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। উজ্জ্বল দীপ্ত তার মুখমন্ডল, হাসিভরা মুখে বললো বনহুর—রহমান, সত্যিই রাখে আল্লা মারে কে— আমি তার কাছে হাজার শুকরিয়া করছি।

পুলিশ ভ্যান রাস্তায় পড়ে রইলো। বনহুর তার দলবল নিয়ে গহন বনে প্রবেশ করে।

❑

আস্তানায় ফিরে আসতেই একটা আনন্দের বন্যা বয়ে চললো অনুচরগণের মধ্যে।

সমস্ত অনুচর দস্যু বনহুরকে অভিনন্দন জানালো নতুন করে। নানা রকম উৎসব আর আনন্দ শুরু হলো আস্তানায়।

বনহুর অবাক হলো একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে। সবাই এসে বনহুরকে কুর্ণিশ জানিয়ে গেলো, কিন্তু নূরী তো এলো না!

বনহুর কিছুতেই শান্তি পাচ্ছে না। কেমন একটা অস্থির ভাব তাকে চঞ্চল করে তুলেছে। নূরীর সাক্ষাৎ না পাওয়ায় তার মনে এ অশান্তি।

সন্ধ্যায় একটা বড় রকম উৎসবের আয়োজন করেছে রহমান। সর্দার জয়ী হয়ে ফিরে এসেছে, এটা যে তাদের কত বড় খুশীর বিষয়—তারা অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করেছে।

বনহুর প্রতি মুহূর্তে নূরীর আগমন প্রতীক্ষা করেছে কিন্তু কোথায় নূরী। এত বড় একটা বিপদ থেকে সে উদ্ধার লাভ করে এলো, মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলো সে, অথচ নূরী একটি বার এলো না তার কাছে।

বনহুর রহমানকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলো আস্তানায় ফিরে—নূরীকে দেখছিনা কেন রহমান! ও ভাল আছে তো?

জবাবে বলেছিলো রহমান—সর্দার, নূরী এ' কদিন সব সময় আপনার জন্য কাঁদাকাটি করেছে, এমন কি আহার নিদ্রা তার ছিলো না।

এত যার ব্যথা তার জন্য এখনও সে এলো না কেন? বনহুর নিজ বিশ্রামকক্ষে চিন্তিতভাবে পায়চারী করছিলো।

বনহুর নূরীকে না দেখলেও নূরী তাকে দেখেছিলো গোপন স্থান থেকে। আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়েছিলো তার হুর ফিরে এসেছে বলে। অতি কষ্টে নিজকে সামলে রেখেছিলো নূরী কোনোরকমে। লাখো লাখো শুকরিয়া করেছিলো সে খোদার দরগায়।

নূরী এবার শিশু মনিকে কোলে করে বনহুরের বিশ্রাম কক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ালো, মনির কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললো—মনি, যাও তোমার বাপি এসেছে।

মনি খুশীতে ডগমগ হলো, নূরীর কোল থেকে নেমে ছুটে গেলো কক্ষে।

বনহুর মনির পদশব্দে ফিরে তাকাতেই মনি জড়িয়ে ধরলো তাকে—বাপি!

বনহুর তুলে নিলো কোলে, চুমোয় চুমোয় মনির মুখ ভরিয়ে দিয়ে বললে—তোমার আম্মি কোথায় মনি?

নূরী তখন আড়ালে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলো, বনহুরের কথাটা কানে যেতেই অনাবিল একটা শান্তিতে ভরে উঠলো তার মন। খুশীতে উজ্জল হলো তার চোখ দুটো, কিন্তু গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়লো দু'ফোঁটা অশ্রু।

মনি তখন বলছে বাপি, আম্মি ঐ দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বনহুর তাকালো দরজার দিকে।

নূরী সেই মুহূর্তে সরে যাচ্ছিলো, বনহুর মনিকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে দ্রুত সরে এসে নূরীর দক্ষিণ হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরলো।

নূরী মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালো, কোনো কথা বললো বা বা বনহুরের মুখের দিকে তাকালো না।

বনহুর নূরীর মুখখানা তার নিজের দিকে টেনে নিয়ে বললো—এ কি, তোমার চোখে আজ পানি কেন নূরী?

নূরীর ঠোঁট দু'খানা কেঁপে উঠলো শুধুমাত্র; কোনো কথা সে বলতে পারলো না।

বনহুর মনিকে লক্ষ্য করে বললো—যাও, খেলোগে মনি।

মনি একবার নূরী আর বনহুরের মুখের দিকে তাকিয়ে চলে গেলো।

বনহুর নূরী সহ কক্ষে প্রবেশ করলো, দক্ষিণ হাতে নূরীর চিবুক ধরে উঁচু করে বললো—কি হয়েছে তোমার বলো না?

হঠাৎ নূরী দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বনহুর নূরীকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে নিয়ে বললো— কি অন্যায় আমি করেছি, বলো? জবাব দাও নূরী?

অন্যায় তুমি করোনি, করেছি আমি।

নূরী!

হুর, তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

কেন?

না না, বলতে পারবো না। বলতে পারবো না আমি।

আমিও কিছুতেই ছাড়বো না তোমাকে.....বনহুর নূরীকে আরও নিবিড়ভাবে টেনে নেয় কাছে।

নূরী কোনো কথাই বলতে পারে না, বনহুরের প্রশস্ত বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

বনহুর সস্নেহে হাত বুলিয়ে দেয় নূরীর মাথায়-পিঠে।

নূরী ভুলে যায় কিছুক্ষণ পূর্বে জোবাইদার সঙ্গে তার কথাগুলো, ভুলে যায় বনহুরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়নি। ভুলে যায় সমস্ত পৃথিবীটাকে, ভুলে যায় সে নিজের অস্তিত্ব......

পরবর্তী বই

অন্ধ মনিরা

এই সিরিজের পরবর্তী বই
অন্ধ মনিরা